প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন ১৩৬১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
রবীন দত্ত

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

অভিযাত্রী তীর্থ সুন্দরডুঙ্গা

দেওবনের দিগন্তে

ত্রিশূলী তীর্থের পথে

হিমালয় ভ্রমণ ও গাইড

হিমালয়ের মানুষ

পাহাড় পাহাড় খেলা [পর্বতারোহণ] (যন্ত্রস্থ)

ভূমিকা

পর্বতারোহণ স্বীকৃত ক্রীড়া হিসাবে জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শৈলারোহণ, ট্রেকিং ও ক্যাম্পিং জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা সংগঠন তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযানের প্রেরণা দিচ্ছেন। বিশ্বের অন্যতম সংস্থা 'আউটওয়ার্ড বাউণ্ড স্কুল'-এর আদর্শে তরুণ সম্প্রদায়ের চরিত্র গঠনের জন্য পর্বতারোহণ, শৈলারোহণ, অরণ্য-পাহাড় ও মরুভূমিতে ভ্রমণ, খরস্রোতা নদীতে ভেলা ভাসানো খেলা, ট্রেকিং ও ক্যাম্পিং এবং স্কাউটিং-এর আয়োজন করছেন। শত শত তরুণ-তরুণী এইসব রোমাঞ্চকর দুঃসাহসী অভিযানে অংশ নিচ্ছে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পর্বতারোহণের মতোই শৈলারোহণ, ট্রেকিং, ক্যাম্পিং এবং অন্যান্য দুঃসাহসিক ক্রীড়ায় পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী। বাঙ্গালী তরুণের রোমাঞ্চকর অভিযানের মধ্যে কনোজী আংরের ক্ষুদ্র নৌকায় সমুদ্র পথে আন্দামান অভিযান, পায়ে হেঁটে থর মরুভূমি অভিযান, দুর্জয় পর্বতশৃঙ্গ মানা-কামেট আরোহণ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ ছাড়াও বহু পর্বত শিখর অভিযান, দুর্গম হিমালয়ের সম্পূর্ণ অজানা পথ আবিষ্কার, সারা ভারত পায়ে হেঁটে ভ্রমণ, সাইকেল অথবা মোটর-বাইকে পৃথিবী পরিক্রমা ইত্যাদিই প্রমাণ করে দুঃসাহসিক কাজে পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব।

বর্তমানে শৈলারোহণ সংগঠিত ক্রীড়ার পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠছে। কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলের কয়েকটি উৎসাহী পর্বতারোহণ সংস্থা একান্ত নিজস্ব প্রচেষ্টায় শৈলারোহণকে লোকপ্রিয় ক্রীড়ায় পরিণত করার জন্য নিয়মিত শৈলারোহণ শিক্ষাক্রমের আয়োজন করছেন। ওঁদের কেউ বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে, কেউ আদ্রার জয়চণ্ডী পাহাড়ে শৈলারোহণ শিক্ষা শিবির পরিচালনা করছেন শীতের দিনগুলোয়। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী এমনকি প্রৌঢ়রা পর্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন সংগঠন আয়োজিত শৈলারোহণ শিক্ষাক্রমে যোগ দিচ্ছেন। শীতের ক্রিকেটের মতো শৈলারোহণ শিক্ষার জনপ্রিয়তা বাড়ছেই।

পর্বতারোহণ ব্যয়সাপেক্ষ তাই সবার পক্ষে পর্বতারোহণের স্বাদ মেটানো সম্ভব নয়। কিন্তু শৈলারোহণ মোটেই ব্যয়বহুল ক্রীড়া নয়। শৈলারোহণের রোমাঞ্চ পর্বতারোহণের চেয়ে কম নয়। যাদের পর্বতারোহী হবার বাসনা

আছে তারা আগে শৈলারোহণ শিখে নিয়ে পর্বতারোহণের শিক্ষা নিতে যায়। এ দুই কারণে শৈলারোহণ আজ সংগঠিত ক্রীড়ারূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক স্তরে শৈলারোহণ, পর্বতারোহণ, ট্রেকিং ও ক্যাম্পিংকে শিক্ষার আওতায় এনে এ ক্রীড়াকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রতিটি স্কুল-কলেজে শৈলারোহণ ও পর্বতারোহণ অবশ্য শিক্ষণীয় ক্রীড়ারূপে পরিগণিত হবার দিন আসন্নপ্রায়।

শৈলারোহণ যতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ততই মাতৃভাষায় সহজবোধ্য শৈলারোহণ শিক্ষার গ্রন্থের অভাব অনুভূত হচ্ছে। কলকাতার মাউণ্টেনীয়ার্স ক্লাবের বাৎসরিক শৈলারোহণ শিক্ষাক্রমের সঙ্গে বহু বছর ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থেকে দেখেছি শিক্ষার্থীদের ওই একই অনুযোগ। এমন কি ১৯৭১ সালে দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনষ্টিটিউটের এ্যাডভেঞ্চার কোর্সের দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষাদানকালে ভারতের নানা প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী স্কুল-কলেজের ছাত্র শিক্ষার্থীদের 'পর্বতারোহণ ও শৈলারোহণ শিক্ষার' গ্রন্থ নেই কেন এ-প্রশ্নও বারবার করতে শুনেছি। শিক্ষাদানের সময় বাংলা ও হিন্দীতে প্রায়ই ব্যাখ্যা করতে হয়েছে।

দার্জিলিং-এ থাকাকালীন মনে মনে স্থির করি, এমন একটি গ্রন্থ রচনা করলে কেমন হয়? পর মুহূর্তেই দুর্ভাবনা, পারব তো এই কঠিন কাজটি করতে! কলকাতায় ফিরেই দেখা করি আমার অগ্রজপ্রতিম প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আমার যা কিছু রচনা, যা কিছু পরিকল্পনা সবই তাঁর সদয় উপদেশ আর স্নেহশীল শাসনে গ্রথিত। পরিকল্পনার কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমায় যুগান্তর পত্রিকার নব সংযোজিত "নব-নায়ক" ফিচার কলামে লেখার সুযোগ দেন। খানিকটা দুঃসাহস নিয়েই শুরু করেছিলাম শৈলারোহণের ওপর লেখা। সেই লেখা "পাহাড় পাহাড় খেলা" নামে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবার সময়ই পর্বতারোহী এবং শৈলারোহী মহল ছাড়াও সাধারণ পাঠকের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

যুগান্তরে লেখা সেই ফিচার পরে সংশোধিত ও পরিবর্তিত আকারে "পাহাড় পাহাড় খেলা" শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। এ-গ্রন্থে শৈলারোহণ সংক্রান্ত নিয়মকানুনের বিষয় আলোচনা করেছি! পর্বতারোহণের বিষয়ে পরবর্তী গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। তরুণ শৈলারোহণ ও পর্বতারোহণ শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের কাছে এ-গ্রন্থ আদৃত হলেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে।

জন্মাষ্টমী ১৩৮১ **সুনীল চৌধুরী**
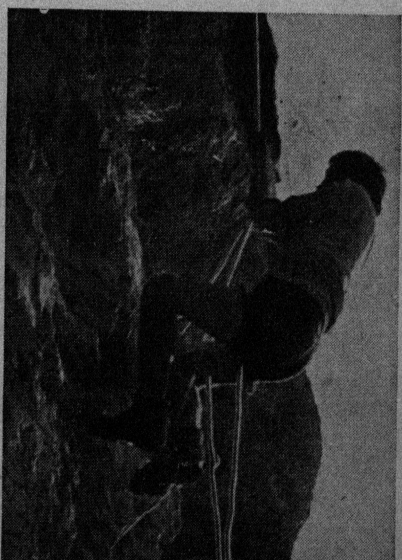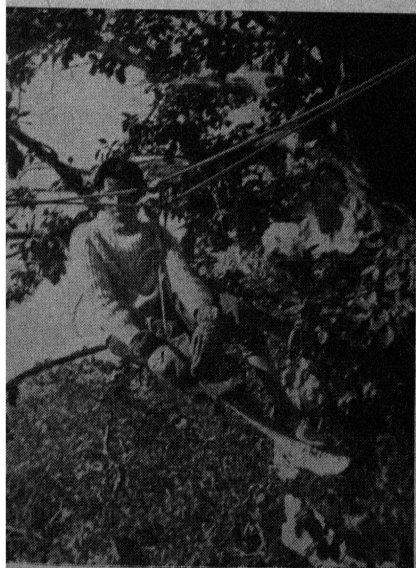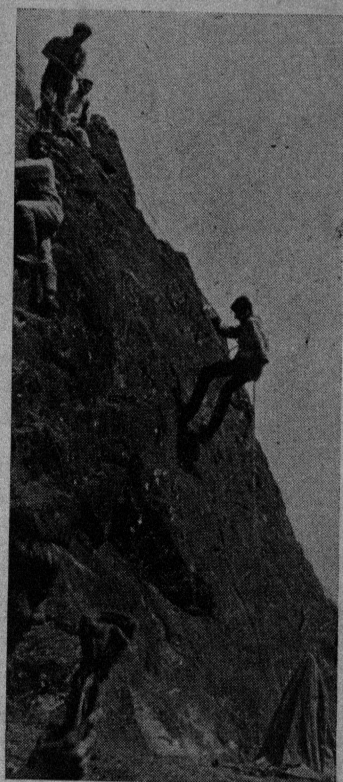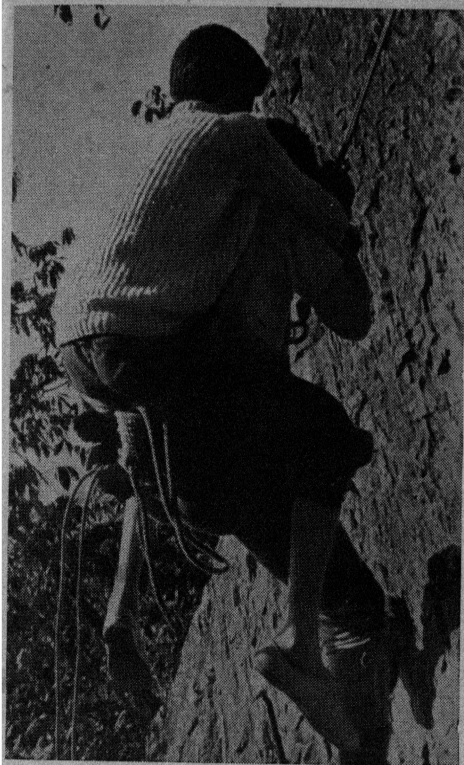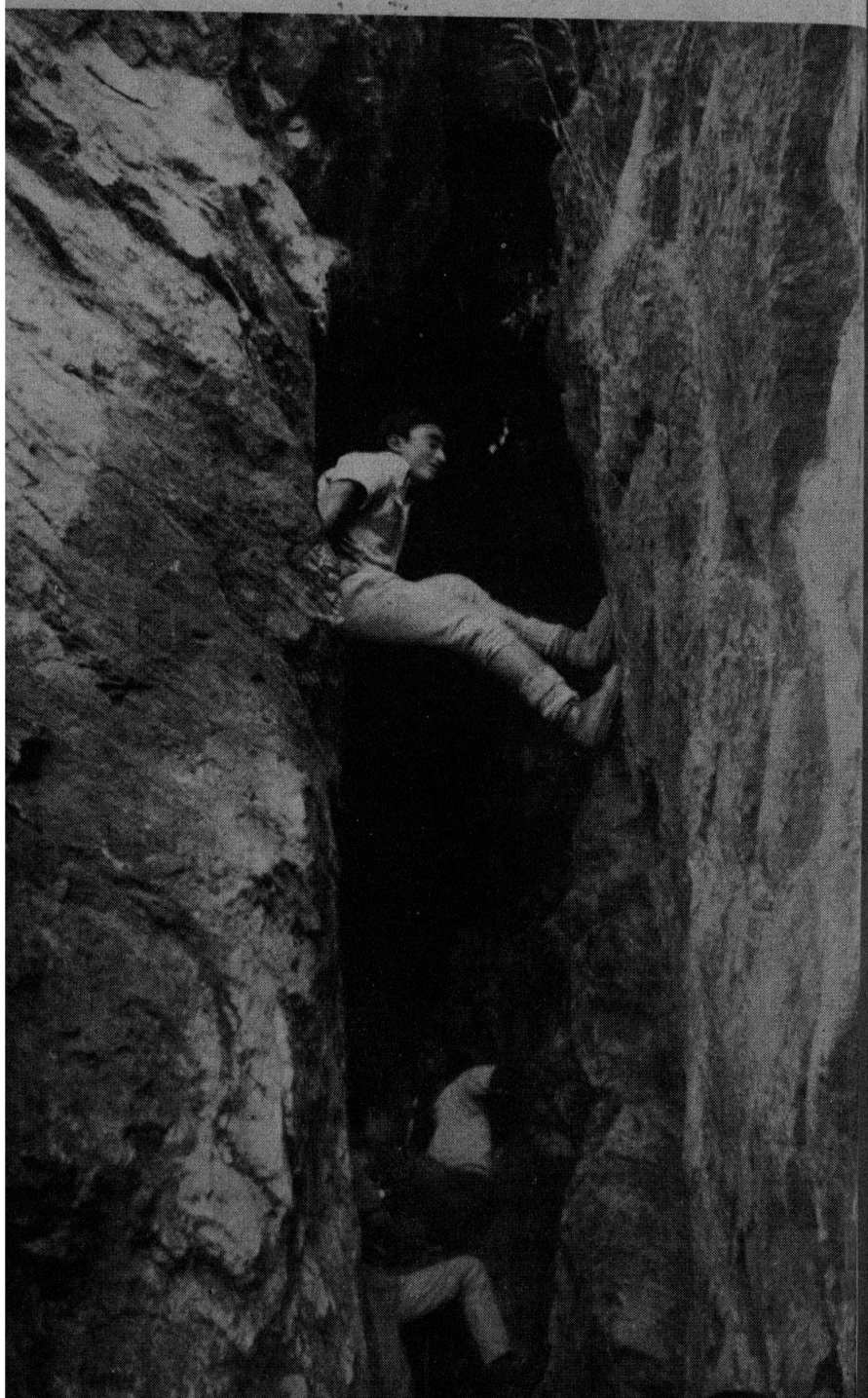
আমাদের পরিচিত বিভিন্ন ক্রীড়ার মধ্যে বর্তমানে পর্বতারোহণ খেলাধূলার আসরে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। শৈলারোহণ ইতিমধ্যেই খেলা-ধূলার পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং ক্রীড়া সংস্থা নিয়মিত শৈলারোহণ শিক্ষাক্রমের আয়োজন করে চলেছে। দলে দলে ছাত্র ছাত্রী শৈলারোহণ শিক্ষা গ্রহণ করছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ হিমালয়-ভ্রমণ এবং পর্বতাভিযান বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভূ´ত করে পর্বতারোহণকে ক্রীড়ার মর্যাদা দিয়েছেন।

পর্বতারোহণের সূচনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভা (সুইজারল্যাণ্ড) নিবাসী De Saussuie নামের এক প্রকৃতি প্রেমী ভদ্রলোক ঘোষণা করলেন, যে সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত পর্বতশীর্ষ Mount Blanc (১৫,৭৮১ ফুট) আরোহণ করতে পারবে তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর বাদে অর্থাৎ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে Jacque Balmat এবং Paccard নামেই দুই ভদ্রলোক আল্পস পর্বতমালায় অবস্থিত Mount Blanc পর্বতশীর্ষ আরোহণ করে ঘোষিত পুরস্কার দাবী করলেন। প্রকৃত পর্বতারোহণের সূচনা সেই থেকে।

কিছুদিন বাদে De Saussuie নিজে Mount Blanc আরোহণ করেন। তাঁর পরিবার পরিজন তাঁর সঙ্গে Chamonix গ্রামের মূল শিবিরে যান। এবং প্রচুর উৎকণ্ঠা নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন। দু'দিন বাদে De Saussuie সাফল্যের সঙ্গে শিখর আরোহণ করে ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেও আল্পসে পর্বতাভিযান হয়েছে। সে অভিযানগুলি কখনো একক কখনো বিচ্ছিন্ন ভাবে হয়েছে। ১৪৯২

খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা অষ্টম চার্লসের নির্দেশে তাঁর সভাসদ Autoine de Ville'র আল্পস পর্বতের Mount Aiguille আরোহণই প্রথম পর্বতারোহণ বলে ধরা যায়।

Edward Whymperকে ইওরোপীয় পর্বতারোহণের জনক বলা হয়। ইনি জাতীতে ইংরাজ এবং কর্মজীবনে লণ্ডনের এক প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সংস্থার কাজ ছিল পাহাড় পর্বতের চিত্র এবং ম্যাপ প্রকাশ করা। Edward Whymper আল্পস পর্বতে এসেছিলেন সেই কাজ নিয়েই। পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করতে করতে শেষে আল্পসের প্রেমে পড়ে যান, এবং বহু স্মরণীয় আরোহণ করেন কখনো একাকী কখনো দলবদ্ধভাবে।

তাঁর শ্রেষ্ঠ আরোহণ ম্যাটারহর্ণ (Matterhorn) শিখর (১৪,৬৮৫ ফুট)। সুইজারল্যাণ্ডের Zermath গ্রামের ওপরে অবস্থিত ম্যাটারহর্ণ শিখর তিনি মাত্র ২৬ বছর বয়েসে, ১৮৬৫ সালে আরোহণ করেন।

তাঁর আরোহণের মধ্যে কোনো পুরস্কার প্রাপ্তির লোভ ছিল না। পর্বত আরোহণের রোমাঞ্চই ছিল তাঁর আনন্দ। আর এই নিছক রোমাঞ্চের টানে তিনি বারবার ম্যাটারহর্ণ আরোহণের প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছেন। কখনো দক্ষিণ দিক থেকে, কখনো উত্তর অর্থাৎ ইটালীর দিক থেকে চেষ্টা করে শেষে ম্যাটারহর্ণ আরোহণ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের সেই অভিযানে সাতজন সফল শিখর আরোহীর চারজন দুর্ঘটনায় নিহত হন।

ম্যাটারহর্ণ শিখর থেকে অবতরণের সময় সাতজন সদস্যই একটি দড়িতে বাঁধা ছিলেন। Hadson নামের একজন সদস্য কঠিন পরিশ্রমের ফলে খুবই কাহিল হয়ে পড়েন। তাঁকে অ্যালপাইন গাইড Ceoz প্রতিমুহূর্তে সাহায্য করছিলেন। কিন্তু কঠিন শৈলশিরার এক জায়গায় Hadson-এর পা পিছলে যায়—ফল পতন। পতনের ফলে দড়িতে টান পড়ে। পরপর চারজন সদস্য Ren Charles,

Ceoz, Hadson এবং Lord Francis Douglas নিজেদের পতন রোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। পিছনের তিনজন সদস্য—Whymper, Guide Peter Tanguraldir এবং Junior Tanguraldir আপ্রাণ চেষ্টা করে একটা বড় পাথরে নিজেদের ভাগের দড়ি জড়িয়ে ফেলেন। প্রথম চারজন সদস্য কয়েক হাজার ফুট ওপর থেকে বেশ কিছুক্ষণ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকার পর পাথরে ঘষা খেয়ে দড়ি ছিঁড়ে যায় অবশেষে। প্রথম চারজন আছড়ে পড়েন পাঁচ হাজার ফুট নিচের হিমবাহে। ম্যাটারহর্ণ পর্বতে করুণ মৃত্যু ঘটল সেই প্রথম।

Whymper পাগলের মতো হয়ে গেলেন। অনেকে বলে, তিনি নাকি দড়ি কেটে দিয়েছিলেন নিজে বাঁচার জন্য। এই অভিযোগের সত্য মিথ্যা যাচাই হয়নি। তবে পর্বতারোহী হিসেবে আমি অন্তত এই অভিযোগ বিশ্বাস করি না। প্রকৃত পর্বতারোহীরাও বিশ্বাস করেন না। এ ঘটনার পর ইংল্যাণ্ডে দারুণ হইচই শুরু হয়ে যায়। কেউ বলে পর্বত অভিযান আত্মহত্যার সামিল, কেউ বলে ওরা পাগল ওদের সাজা দাও, কেউ বলে বন্ধ করো এই বিপজ্জনক খেলা। ইংল্যাণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে Lord Francis Douglas-এর মৃত্যু সম্ভ্রান্ত পরিবারে শোকের ছায়া ফেলেছিল। রাণী ভিক্টোরিয়া পর্বতারোহণ চিরতরে বন্ধ করার প্রস্তাব করেছিলেন। যদিও তাঁর প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সেই বেদনাদায়ক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়েই প্রকৃত পর্বত অভিযানের জন্ম হয়েছিল।

ইওরোপ থেকে পর্বতারোহণের ঢেউ উনবিংশ শতাব্দীতেই হিমালয়ে এসে আছড়ে পড়েছিল। এসেছিলেন বিখ্যাত পর্বতারোহীরা ইওরোপের নানা প্রান্ত থেকে। বেশির ভাগ জরীপের কাজে হিমালয়ের গহন কন্দরে ভ্রমণ করেছেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে Frank S. Smythe-এর অবদান অবিস্মরণীয়। • ইতিমধ্যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট (২৯,০২৮ ফুট) আবিষ্কার করলেন

রাধানাথ সিকদার। হিমালয়ের আকর্ষণ আরো বাড়লো। দলে দলে অভিযাত্রীরা এলেন এভারেষ্ট আরোহণ করতে। পর্বতারোহণের জোয়ার বইল এদেশে। এ জোয়ারে ভারতীয়দের কোনো ভাগ ছিল না সেকালে। সবটাই ইওরোপীয়দের উৎসাহে এসেছিল। যদিও কিছু ভারতীয় শেরপা এই সব অভিযানে মালবাহকের কাজ করতে গিয়ে ইওরোপীয়দের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আরোহীর মর্যাদা তারা পায়নি তখনো।

১৯৫৩ সাল পর্বতারোহণের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। এ বছর পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর এভারেষ্ট আরোহণ করেন শ্রীতেনজিং নোরগে এবং স্যার এড্‌মণ্ড হিলারী। দলনেতা ছিলেন স্যার জন হাণ্ট।

এভারেষ্ট আরোহণ ভারতীয় যুবমানসে বিচিত্র এক আলোড়ন আনলো। এবারের জোয়ারে ভারতীয়রা সওয়ার হল। তরুণ যুবকরা পর্বতারোহণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ছুটলো সাফল্যের শিখরের দিকে। সেই যে চলার শুরু আজও তার বিরাম নেই—বিরাম নেই সাফল্যের চূড়ায় আরোহণের।

ভারতীয় অভিযাত্রীদের এভারেষ্ট আরোহণের রেকর্ড আজও অমলিন। ১৯৬৫ সালে কমাণ্ডার এম. এস. কোহলীর নেতৃত্বে মোট নয়জন সদস্য চারবার এভারেষ্ট আরোহণ করেন।

পর্বতারোহণ শব্দ আগে এ দেশে তেমন চালু ছিল না। পর্বতারোহণের পরিবর্তে হিমালয়ে তীর্থযাত্রা-ই জানা ছিল বেশি। শত শত বছর ধরে ভারতীয় তীর্থযাত্রীরা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে কেদার-বদরী, গঙ্গোত্রী-গোমুখ-যমুনোত্রী, অমরনাথ গুহা আর কৈলাস মানস-সরোবর ভ্রমণ করতেন। হিমালয়ের হৃদয় থেকে গঙ্গা, যমুনা, অলকানন্দা ইত্যাদি নদী আবির্ভূত হয়েছে। সে সব নদীও আমাদের কাছে খুবই পূতঃ পবিত্র। নদীর উৎসে পৌছনোর জন্যও তীর্থযাত্রীরা ছুটত হিমালয়ে— উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ।

সেকালে হিমালয়ের তীর্থযাত্রী বলতে বোঝাতো সাধু-সন্ন্যাসী এবং সংসার ত্যাগী তিনকাল পেরিয়ে এক কালে পা দেওয়া বৃদ্ধ মানুষদের। তাঁরা মোক্ষের আশায় ছুটতেন হিমালয়ে—গৃহে ফেরার আশা পরিত্যাগ করে।

সেকালের তীর্থ যাত্রার একটি মজার চিত্র আজও আমার চোখের সামনে ভাসে।

আমাদের বাড়ির সামনে এক বৃদ্ধা থাকতেন। তাঁকে আমরা সবাই জ্যাঠাইমা বলে ডাকতাম। বিধবা হবার পর সংসারের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মালো। ঠিক করলেন কেদার-বদরী তীর্থে যাবেন। সঙ্গীও জুটে গেল বেশ কয়েকজন।

প্রায় ছ'মাস ধরে যাত্রার আয়োজন চললো। নানা বস্তুতে তাঁর পোঁটলা ভারী হতে থাকল। অবশেষে যাত্রার দিন সকালে উকিল ডাকিয়ে স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি একমাত্র দেওরপোর নামে দানপত্র করে দিলেন। ভাগ্যবান দেওরপোর চোখ তো ছানাবড়া। এতবড় ভাগ্য তারই অপেক্ষায় ছিল এ সে ভাবতেই পারে না।

যাত্রার আগের মুহূর্তে জ্যাঠাইমা একমাত্র দেওরপোকে ডেকে একটা চাবির গোছা দিলেন।

যুবক চাবির গোছা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এটা দিচ্ছ কেন জেঠিমা ?

জেঠিমা বড় একটা সিন্দুক আর আলমারি দেখিয়ে দার্শনিকের মতো বললেন, দুর্গম তীর্থে যাচ্ছি বাবা। আর তো ফিরে আসবো না। এখন এসব সম্পত্তি তোর, চাবিটাও দিয়ে দিলাম।

যুবকটি তাজ্জব হয়ে গেল। সিন্দুকে কি আছে তা দেখার কৌতূহল ওর ছোটবেলা থেকে। কতবার জ্যাঠাইমাকে ম্যানেজ করে সিন্দুকের ভেতরের বস্তু দেখতে চেষ্টা করে মার খেয়েছে তার ঠিক নেই। আর সেই সিন্দুকের চাবি কিনা ওর হাতের মুঠোয়! অবাক হবারই কথা।

জ্যাঠাইমা ঝগড়াটে বলে পাড়ার মহিলারা সবাই এড়িয়ে থাকতো। যাত্রার দিন দেখলাম আর এক চিত্র। পাড়ার মেয়েপুরুষ সবাই ওঁর বাড়িতে জমায়েত হয়েছেন। উনি আর ফিরবেন না সেইজন্যই এসেছেন সবাই।

বাড়ির আর পাঁচজন গলা জড়িয়ে মরা কান্না কাঁদছিল। কান্নার মধ্যে কত কি বিলাপ করছিল তা আজ আর মনে নেই। তবে বিলাপে জ্যাঠাইমার গুনগানই ছিল। জ্যাঠাইমার চোখ দুটোও জলে ভাসছিল।

যে জ্যাঠাইমার সঙ্গে যুবকটির তেমন সদ্ভাব ছিল না তাকেও হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখলাম।

জ্যাঠাইমা গেলেন হিমালয়ে তীর্থযাত্রায় বৈরাগী হয়ে।

দিনের পর দিন এবং মাসও পার হয়ে গেল। পাড়ার মানুষ তো বটেই এমনকি জ্যাঠাইমার দেওরপো এবং পরিবারের অন্যান্যরা পর্যন্ত ভুলে গেল তাঁর কথা।

আর ঠিক তখনি জ্যাঠাইমা ফিরলেন সদলবলে তীর্থ সেরে।

সেদিন পাড়াসুদ্ধ মানুষের সঙ্গে আমিও দেখতে গেলাম জ্যাঠাইমাকে। বাড়িতে কুলগুরু এলে যেমন পরিবারের সবাই তাঁর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তেমনই পাড়াসুদ্ধ লোক জ্যাঠাইমার পায়ে আছড়ে পড়লো। এমন ভাগ্যবতী পুণ্যশীলা রমণীর পদরজ পাওয়া পরম ভাগ্যের ব্যাপার। জ্যাঠাইমাকেও দেখলাম খুব খুশি মনে সবাইকে আশীর্বাদ করছেন।

লক্ষ্য করলাম, সবাই এলেও একজন ব্যতিক্রম। সে হল জ্যাঠাইমার দেওরপো। বিষাদ মাখা মুখে দূরে বসে আছে। আসলে হয়তো সে বেচারা ভাবতে পারেনি যে শেষে জ্যাঠাইমা ফিরবেন।

কয়েক দিন শান্ত থাকলেও হঠাৎ একদিন চিৎকার আর কান্নায় পাড়ার লোক সচকিত। সবাই ভিড় করলো জ্যাঠাইমার বাড়িতে।

দান করা সম্পত্তি আর চাবির গোছার হক নিয়ে দেওরপোর সঙ্গে তুলকালাম ঝগড়া—বাড়িতে কাকচিল বসতে পারে না।

সেকালের হিমালয়ে তীর্থযাত্রা এমনই ছিল।

১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রীদের এভারেষ্ট বিজয়ের পর পশ্চিমবঙ্গের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীতেনজিং নোরগের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ভারতের সর্বপ্রথম পর্বতারোহণ বিদ্যালয় স্থাপন করলেন দার্জিলিংয়ে। তেনজিংই প্রথম এর ডাইরেকটর। পরবর্তীকালে দার্জিলিংয়ে এই বিদ্যালয় হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনষ্টিটিউট নামে জগৎ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে এবং এর প্রথম অধ্যক্ষ হন প্রখ্যাত পর্বতারোহী মেজর নন্দু জয়াল।

প্রথম দিকে কলেজের জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর ছাত্ররা এবং কিছু সামরিক বিভাগের অফিসাররা ট্রেনিং কোর্সে যোগ দেন। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বহু ছাত্র ছিল।

পাঁচ বছরে অনেক কিছু অদল বদল হল। সৈন্য বাহিনীর কিছু পর্বতারোহী হিমালয়ের কয়েকটি শৃঙ্গে অভিযান চালালো। কারো ভাগ্যে সাফল্য এলো, কারো এলো না। এদের মধ্যে পথিকৃৎ দেরাদুনের দুন স্কুল। ওই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অনেকগুলো অভিযান করলো হিমালয়ে।

বাংলাদেশের ছেলেরা বসেছিল না। তারা বার্ধক্যের জন্য অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়েছিল হিমালয়ের নানা তীর্থে। এর জন্য অবশ্যই শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক এবং হিমালয় পরিব্রাজক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের মহাপ্রস্থানের পথে বই এবং তার চিত্ররূপ যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল যুব মানসে।

১৯৬০ সাল।

বাংলাদেশের পর্বতারোহণের ইতিহাসে সোনায় লেখা বছর সেটা। হিমালয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্‌যোগে এবং আনন্দবাজার পত্রিকার

আর্থিক সাহায্য ও অনুপ্রেরণায় নন্দাঘুন্টি অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রীসুকুমার রায়-এর নেতৃত্বে দশজন সদস্যের এক অভিযাত্রী দল সাফল্য সহকারে নন্দাঘুন্টির শিখর আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নাম পর্বতারোহণের তালিকায় স্থান পেল।

ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের অর্থাৎ যাঁরা পর্বতারোহণে অংশ নেননি কখনো, তাঁদের ধারণা পাল্টালো। হিমালয়ের দুর্গম পথে তাঁরা পা বাড়ালেন। এটাই আমাদের দেশে পর্বতারোহণের সূচনা বলা যেতে পারে। এমন খুব সামান্য পর্বতারোহী আছেন যাঁরা প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কেদার-বদরী তীর্থযাত্রা না করেছেন। হিমালয়ে তীর্থ ভ্রমণ করে তাঁদের মত পাল্টেছে। একটু একটু করে তাঁরা আরও কঠিন কঠোর দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছেন। দূর-দুর্গম হিমালয় তাঁদের কাছে সরে এসেছে এবং পর্বতারোহণ যে একটা ভীষণ কাজ নয় তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা সত্যিকারের পর্বতারোহী হবার বাসনা নিয়ে গেছেন হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইনষ্টিটিউটে অথবা নেহরু ইনঃ অব্ মাউন্টেনীয়ারিং-এ প্রশিক্ষণ নেবার জন্য। পর্বতারোহণ শিক্ষার পর এঁরা বিভিন্ন ক্লাব গঠন করে পর্বতাভিযানের আয়োজন করেছেন। ছুটেছেন অজানাকে জানার প্রেরণায়। একের পর এক জয়মাল্য নিয়ে তাঁরা ফিরেছেন। ভয়কে জয় করে হয়েছেন দুঃসাহসী।

দুঃসাহসিক পর্বতারোহণ এসেছে পরিচিত খেলাধূলার পর্যায়ে।

ইওরোপের বিভিন্ন দেশে শৈলারোহণ এবং পর্বতারোহণ বহুদিন আগেই খেলাধূলার পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। ব্যবস্থাপনায় আছে সেসব দেশের সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা।

শীতের প্রারম্ভে শহর কলকাতার কিশোর তরুণ যুবক যেমন শহর থেকে দূরে কিছুটা গ্রাম্য পরিবেশে চড়ুইভাতি করতে বেরোয়

দলে দলে, তেমনই ইওরোপের কিশোর তরুণদের ছুটির দিনের খেলা —পাহাড় পাহাড় খেলা। সে খেলায় যেমন পাহাড় চড়ার আনন্দ, তেমনই চড়ুইভাতির গন্ধ থাকে।

ইওরোপের বিভিন্ন দেশের কিশোর আর তরুণেরা সপ্তাহ শেষে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পাহাড় চড়তে। শুক্রবার রাত্রে স্কুল-কলেজের কিশোর তরুণেরা ট্রেনে মোটরে চড়ে চলে যায় বিখ্যাত আল্পস পর্বতের দিকে। পাহাড়ের পাদদেশে সরকার পরিচালিত ইউথ হোস্টেলে এসে তারা জমায়েত হয়। সেখানে আছে অ্যাল্পাইন ক্লাবের স্থানীয় শাখা অফিস। ক্লাবে পর্বতারোহণের সব সরঞ্জামই পাওয়া যায়। ছাত্রদল ক্লাবের খাতায় নিজেদের নামধাম লিখে শনিবার সকালে রুকস্যাক পিঠে নিয়ে নির্দিষ্ট পথে পর্বতারোহণ শুরু করে।

পাহাড়ের অভ্যন্তরে আছে 'মাউন্টেন হাট'। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। সেখানে প্রচুর খাবার-দাবার মজুত করা থাকে। থাকে খাট বিছানা। কিশোর তরুণ পর্বতারোহীর দল এই সব 'হাটে' আশ্রয় নেয়। নিজেদের খুশিমতো খাবার নিয়ে নির্দিষ্ট একটি বাক্সে খাবারের দাম রেখে দেয়। বাসনপত্র এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সব কিছুই থাকে সেখানে। যদি আবহাওয়া খারাপ হয়েও যায় ওখানে বেশ কিছুদিন থাকতে পারে যে কেউ। 'মাউন্টেন হাটে' যারাই থাকে বা ওঠে তারাই সেখানকার খাতায় নিজের নিজের নাম ঠিকানা লিখে আসে। পর্বতশীর্ষে যারা পৌঁছতে পারে, তারা শিখরে রাখা রেজিস্টার খাতায় নিজেদের নাম স্বাক্ষর করে আসে। এই রেজিস্টার থেকে হিসাব পাওয়া যায়, সারা বছরে কতজন শিখর আরোহণ করলো। সে হিসাবটি আবার অ্যাল্পাইন জার্নালে প্রকাশিত হয়।

রবিবার আরোহী কিশোর তরুণেরা সবাই ফিরে আসে নিচের ইউথ হোস্টেলে। রাত্রের গাড়িতে তারা ফিরে যায় যে যার বাড়ি।

পাহাড়ের পাদদেশের ইউথ হোস্টেলের সঙ্গে অ্যাল্পাইন ক্লাব যুক্ত থাকে। ক্লাবের নিযুক্ত অ্যাল্পাইন গাইড তরুণ পর্বতারোহীদের

পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করে। এই গাইডরা পর্বতারোহণের প্রশিক্ষক। প্রতিটি ছেলেমেয়ে এখানে এসে নাম লিখিয়ে যেমন পাহাড় চড়তে যায়, তেমন ফেরার সময়ও হাজিরা দিয়ে যেতে হয়। যদি দেখা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো ছাত্র অথবা ছাত্রের দল অনুপস্থিত, তাহলেই এখান থেকে সন্ধানকারী দল পাঠানো হয়। কিংবা, যদি কোনো দুর্ঘটনার সংবাদ আসে, সেই মুহূর্তে উদ্ধারকারী অ্যাল্পাইন গাইডরা বেরিয়ে পড়েন। এই দলে থাকে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরা। তাঁরা হারানো ছেলেদের ঠিক খুঁজে নিয়ে আসেন। পথঘাট এঁদের নখদর্পণে।

পাহাড়পাহাড় খেলায় মেতে উঠেছে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের কিশোর-কিশোরীরা। দুর্গম আল্পস পর্বতমালার নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর বাধা অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে দুঃসাহসী। দুর্গমকে দুর্গম বলে মনে করে না এরা।

যে সব কিশোর-কিশোরী আরো দুর্গম বিপদসংকুল পর্বতে আরোহণ করতে চায় তাদের পর্বতারোহণে বিশেষ শিক্ষা নিতে হয়। শিক্ষা দেয় বিভিন্ন অ্যাল্পাইন ক্লাবের শিক্ষিত গাইডরা। ট্রেনিং কিন্তু খুবই কঠিন। শারীরিক নানা ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ নিতে হয় প্রথম ধাপে। ডাক্তারী পরীক্ষা হয় মাঝে মাঝেই। প্রথম শৈলারোহণ, তারপর বরফে চলার শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে তবেই পর্বতারোহী আখ্যা পাওয়া যায় এবং তখনই তারা পর্বত অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

আমাদের দেশেও এই রকম প্রশিক্ষণের সুযোগ হয়েছে আজকাল। দার্জিলিং এবং উত্তর কাশীতে তেরো থেকে উনিশ বছরের ছেলেদের জন্য এ্যাডভেঞ্চার কোর্সের ব্যবস্থা হয়েছে। ওই বয়সের সুস্থ যে কোনো ছেলে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া আছে বেসিক এবং এ্যাড্ভান্স ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা।

ইওরোপের অ্যাল্পাইন ক্লাবের ট্রেনিং কোর্সে একটি ঘটনা শুনে

ছিলাম শ্রীনোয়াং গোম্বুর কাছে। শ্রীগোম্বু পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্টে দু'বার আরোহণ করে রেকর্ড করেছেন। সুইজারল্যাণ্ডে ট্রেনিং নেবার সময় একদিন ভোরে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রুকস্যাক পিঠে নিয়ে শ্রীগোম্বু পাহাড়ের দিকে চলেছেন। একটানা চড়াই আর উৎরাই। উঠছে আর নামছে শিক্ষার্থীরা। পিঠের রুকস্যাকে ৬০।৭০ পাউণ্ড প্রয়োজনীয় মালপত্র। সারাদিন পাহাড়ে ট্রেনিং চলবে, তাই সবার সঙ্গে প্যাকেটের খাবার, ফ্লাস্‌ক্‌ ভর্তি চা-কফি, থালা-মগ, জলের বোতল সবই আছে পিঠের রুকস্যাকে। প্রায় মাইল চারেক আসার পর হঠাৎ ট্রেনিং ইন্‌স্ট্রাক্‌টর শিক্ষার্থীদের রুকস্যাক নামিয়ে রাখতে বললেন। প্রয়োজনীয় সব কিছু শিক্ষার্থীরা নিয়েছে কিনা দেখার জন্য ব্যাগ চেক করা শুরু হল। দেখা গেল, শ্রীগোম্বুর ব্যাগে সবই আছে, নেই কেবল একটা জলের বোতল। তিনি চিন্তায় পড়লেন। বললেন, পথে জল পান করার দরকার হয় না তাঁর। একটা দিন চালিয়ে নেবেন। কিন্তু ইন্‌স্ট্রাক্‌টর শুনলেন না সে কথা। আদেশ করলেন ফিরে যেতে এবং ফেলে আসা জলের বোতল নিয়ে আসতে।

৭০ পাউণ্ড ভারী সেই রুকস্যাক পিঠে নিয়ে একাকী চার মাইল পথ আবার তাঁকে ফিরে আসতে হয় এবং ক্যাম্প থেকে সামান্য জলের বোতলটি নিয়ে ট্রেনিংয়ের জায়গায় হাজির হতে হয়।

শ্রীগোম্বু বলেছিলেন—জলের বোতলটা যদিও সামান্য, কিন্তু না নিয়ে যাওয়াটা তো মারাত্মক ভুল। পাহাড়ে ভুল করলে তার মাশুল দিতে হয় কড়ায় গণ্ডায়। ফিরে আসার সময় মনে মনে রাগ হচ্ছিল বটে, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, ট্রেনিংয়ের কঠোর নিয়ম কানুন সত্যিকারের ভালো পর্বতারোহী তৈরি করে।

এই সেদিন জাপান প্রত্যাগত আমার এক বিশিষ্ট ম্যাজিসিয়ান বন্ধুর কাছে আমাদের এই এশিয়ার নিকটতম প্রতিবেশী জাপানের পর্বতারোহণের কথা শুনছিলাম। প্রোগ্রাম মাফিক জাপানের ছোট

বড় দ্বীপে ম্যাজিক দেখানোর অবসরে বন্ধুটি প্রায়ই পাহাড় অঞ্চলে বেড়িয়ে আসত। প্রতিটি দ্বীপেই পাহাড়-পর্বত আছে। যে দ্বীপে গেছে সেখানের পাহাড়ে স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের পাহাড় চড়তে দেখেছে।

বন্ধুটির ম্যাজিসিয়ান হবার চেয়েও পর্বতারোহী হবার বাসনা ছিল বেশি। বিধিবাম, তাই পর্বতারোহী হওয়া গেল না বলে দেখা হলেই খেদ প্রকাশ করত।

একদিন এক দ্বীপের একটি পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে আলাপ করল গাইড এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। আলাপ আলোচনা করে জানতে পারলো যে সে দেশের ছেলে-মেয়েরা ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স আর অষ্ট্রিয়ার তরুণ-তরুণীদের মতো সপ্তাহান্তিক শৈলারোহণ ক্রীড়ায় মেতে থাকে। সপ্তাহের প্রতি শনি আর রবিবার তারা দ্বীপের বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে শৈলারোহণ অভ্যাস করে। ওদের সাহায্য করার জন্য থাকেন অভিজ্ঞ অ্যাল্‌পাইন গাইড। শৈলারোহণ কিংবা পর্বতারোহণের নানা কলাকৌশল শিখিয়ে দেন ছেলে-মেয়েদের। শেখান তাঁরা—কিভাবে বিপদের মুখ থেকে বেঁচে ফিরতে হয়। এর পরও দুর্ঘটনা ঘটে। আর তখন সেই সব অভিজ্ঞ গাইডরা ছুটে যান সাহায্য করার জন্য। সরকার থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য নিয়ে একটা রেসকিউ দল তৈরি থাকে। যে-কোনো বিপদের সংকেত পেলে তারা ছুটে যায় হেলিকপ্টারে, বিমানে। এর জন্য যে খরচই হোক না কেন, তা সেই শিক্ষার্থীদের কিন্তু ভাবতে হয় না।

ইওরোপের নানা দেশ এবং এশিয়ার জাপান শৈলারোহণ এবং পর্বতারোহণে এত এগিয়ে গেছে যা ভাবা যায় না। সে তুলনায় আমরা এখনো শৈশব অতিক্রম করিনি। তা হলেও, তুলনায় সামান্য আঠারো-বিশ বছরে আমাদের যুবক-যুবতীরা যা করেছে তা প্রায় অলৌকিক।

দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইনষ্টিটিউট এবং উত্তর কাশীর নেহেরু ইনঃ অব্ মাউন্টেনীয়ারিং যুবক-যুবতীদের জন্য বেসিক এবং এ্যাডভান্স মাউন্টেনীয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা তাদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই চালু রেখেছে। ইদানীং তারা কিশোর তরুণ-তরুণীদের জন্য এ্যাডভেঞ্চার কোর্সের প্রবর্তন করেছে। দার্জিলিংয়ের ইনষ্টিটিউটে বছরে দু'টি এ্যাডভেঞ্চার কোর্স হয়। একটি জানুয়ারী মাসে, অপরটি মে-জুন মাসে। মোট ২১ দিনের ট্রেনিংয়ে শিক্ষার্থীদের পাহাড়-জঙ্গল-নদী-নালায় কিশোর মনের উপযোগী এ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা থাকে।

যুগের বিবর্তন এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদির কারণে সারা বিশ্বের তরুণ-তরুণী যখন হতাশায় জীবনের প্রকৃত স্বাদ খোঁজার জন্য বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে, তখন একদল ক্রীড়াবিদ এবং অভিযানপ্রিয় তরুণ-মনের দরদী মানুষ নিঃশব্দে এগিয়ে এসে স্থাপন করেছেন আউটওয়ার্ড বাউণ্ড স্কুল। তাঁদের আদর্শ—"To seek, to Strive and not to yield." প্রতিটি সভ্যকে আউটওয়ার্ড বাউণ্ডয়ের এই শপথ নিতে হয়।

ইওরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশে আউটওয়ার্ড বাউণ্ড স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাজার-হাজার যুবক-যুবতী এই স্কুলের সদস্য হয়ে দলবদ্ধ ভাবে কখনো অরণ্যে, কখনো নদী-সমুদ্রে, কখনো সমতলে, আবার কখনো বা পাহাড়-পর্বতে অভিযান চালাচ্ছে।

আউটওয়ার্ড বাউণ্ডয়ের আদর্শ সামনে রেখে দার্জিলিংয়ের মাউন্টেনীয়ারিং ইনষ্টিটিউট বালকদের জন্য এ্যাডভেঞ্চার কোর্সের ব্যবস্থা করেছে। এই শিক্ষাক্রমের ছাত্রদের কিভাবে স্বাবলম্বী হতে হয় তা হাতে-নাতে শেখানো হয়। একুশ দিনের কোর্সে ছাত্রদের শরীরচর্চা, খেলাধুলা, প্রাথমিক চিকিৎসা, রান্না করা, তাঁবু লাগানো এবং তাঁবুর বিকল্প মাথা গোঁজার ছাউনি তৈরি করা, ট্রেকিং, রক

ক্লাইমিং, মাউণ্টেনীয়ারিং, নদী পারাপার করা এবং গাছে চড়া শেখানো হয়। এ ছাড়া থাকে বিতর্ক, আলোচনা, আবৃত্তি, গান বাজনা, ছবি, লাইব্রেরী, ম্যাপ-রিডিং এবং আরো কত কি।

দার্জিলিংয়ের এই এ্যাডভেঞ্চার কোর্সে আজ শুধু ভারতীয় তরুণরা নয় অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, জাপান, সিলোন এবং বার্মা থেকেও ছাত্ররা দলবদ্ধ ভাবে এসে যোগ দিচ্ছে।

এমন একটি এ্যাডভেঞ্চার কোর্সের চিফ্ ইনস্ট্রাকটর হয়ে দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনষ্টিটিউটে যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলাম। ওখানকার ট্রেনিংয়ের কথা 'পাহাড় পাহাড় খেলা' দ্বিতীয় পর্বে বলবো।

১৯৬০ সালে নন্দাঘুন্টি আরোহণের পর বাংলাদেশে পর্বতারোহণ এবং হিমালয় ভ্রমণের যে জোয়ার এসেছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে একে একে অনেকগুলো পর্বতারোহী সংস্থা গড়ে উঠলো। অভিযানপ্রিয় এবং হিমালয়প্রেমিক যুবক-যুবতীরা দলে দলে সেই সব সংগঠনে যোগদান করলো। শুরু হল হিমালয়ের নানা দুর্গম অঞ্চলে পদযাত্রা—ট্রেকিং।

ট্রেকিং ছাড়াও বছরে দু-একটা পর্বতাভিযানেরও আয়োজন করতে লাগল কয়েকটি ক্লাব। পর্বতাভিযান খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। যদিও সরকার এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সাহায্য করেন, তবুও সবার পক্ষে অভিযান সংগঠন করা প্রায় আকাশ কুসুম।

আর্থিক অনটন এবং সাজসরঞ্জামের অভাবে ভালোভালো পর্বতারোহী থাকা সত্ত্বেও ভালো অভিযান দু'একটির বেশি করা সম্ভব হয়নি। তবে আশার কথা, নানা বাধাবিপত্তি এবং আর্থিক অনটনের মধ্যেও বাঙ্গালী যুবক-যুবতীরা প্রতি বছরই হিমালয়ে ছোটবড় পর্বতশৃঙ্গে অভিযান সংগঠন করছেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেকিং চলছে সমানে। এটি হিমালয়প্রেমী বাঙ্গালীর অভিযাত্রী মনের বৈশিষ্ট্য।

॥ দুই ॥

পর্বতারোহণ এবং শৈলারোহণ যদিও প্রায় সমার্থক, তবু এর পার্থক্য অনেক।

পর্বতারোহণ সাধারণত তুষার-বরফে ঢাকা পর্বতচূড়ায় আরোহণ অর্থেই বোঝায়। পর্বতারোহণের কলাকৌশল তুষার-বরফের ভিত্তি করেই শেখানো হয়। আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়. যেমন ম্যাপ দেখে পথ বার করা, অভিযানের খাদ্যদ্রব্য, সাজ-সরঞ্জাম, মালবাহক ইত্যাদির বাজেট করা, ট্রেকিং, ক্যাম্পিং, মেডিকেল ও রেসকিউয়ের ব্যবস্থা করতে হয়।

শৈলারোহণ অর্থে পাথুরে পাহাড়ের কঠিন গায়ে বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে আরোহণেক বোঝায়। শৈলারোহণের জন্যও ম্যাপ দেখা, সাজ-সরঞ্জাম, খাদ্য, ট্রেকিং, ক্যাম্পিং, মেডিকেল ও রেসকিউয়ের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

পর্বতারোহণ ব্যয় সাপেক্ষ এবং সময়ের প্রয়োজন অনেক বেশি। ছোটখাট যে কোনো পর্বতাভিযানে অন্ততঃ হাজার দশেক টাকা এবং এক মাসের মতো সময় লাগে। এ-হিসেব কেবল হিমালয়ে অভিযানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হিমালয়ে অভিযান করতে সময় এবং অর্থ বেশি লাগার কারণ যোগাযোগের অভাব।

ইওরোপের যে কোনো পাহাড়ের পাদদেশে· অর্থাৎ যেখানে অভিযানের মূল শিবির হওয়া উচিত, সে পর্যন্ত রেল এবং মোটর পথের যোগাযোগ আছে। অভিযাত্রীরা কম সময়ে এবং অল্প খরচে তাদের অভীষ্ট পর্বত শিখরের মূল শিবিরে পৌঁছে যেতে পারে সহজে।

হিমালয়ে ঠিক এর বিপরীত। দুর্গম হিমালয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযাত্রীদের সপ্তাহব্যাপী

ট্রেকিং করতে হয়। বারো থেকে চোদ্দ হাজার ফুট ওপরে মূল শিবির স্থাপন করতে তাদের এনার্জির বারো আনাই ব্যয় হয়ে যায়। তারপর সত্যিকারের পর্বতাভিযান শুরু হয়।

হিমালয়ে অভিযানের খরচের সিংহভাগ নিয়ে নেয় মালবাহক এবং শেরপারা। কয়েক টন মাল তো আর সামান্য আট-দশজন অভিযাত্রী অতদূরে নিয়ে যেতে পারে না। মালবাহক এবং খচ্চর ভাড়া করতেই হয় তাদের। আর এদের পথের খাবার ও মাইনে দিতে ফতুর হয়ে যায় সব অভিযাত্রীদল। ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে মালবাহকের আদৌ প্রয়োজন হতো না। তাতে অর্ধেক পয়সায় এক একটা অভিযান হতে পারত।

এই প্রসংগে একটা ছোটখাট পর্বতাভিযানের কথা বলি যার নেতৃত্ব এবং সংগঠনের দায়িত্ব আমার ওপর ছিল।

কুমায়ুন হিমালয়ের প্রায় অজানা অঞ্চল সুন্দরডুঙ্গায় ১৯৬৯ সালে একটা অভিযান করেছিলাম আমরা। অর্থের অনটনে মাত্র ছ'জন সদস্য দলে নেওয়া হয়েছিল। কোনো শেরপা নিতে পারিনি। কাপকোট থেকে মোট বিশজন মালবাহক এবং চারটি খচ্চর নিয়েছিলাম। আমাদের মালপত্র ছিল প্রায় ৮০০ কিলো।

কাপকোট থেকে সুকরাম মূল শিবির মোট ছয় দিনের পথ। কাপকোটের উচ্চতা ৩০০০ ফুট এবং সুকরামের উচ্চতা প্রায় ১৩০০০ ফুট। এই দশ হাজার ফুট উচ্চতায় পৌছতে আমাদের কখনো উঠতে হয়েছে আট হাজার ফুটে আবার নেমে আসতে হয়েছে সাড়ে চার হাজার ফুটে। শেষে যখন আমরা মূল শিবিরে পৌছলাম তখন প্রায় সবাই কাহিল। কাপকোট থেকে মূল শিবিরের দূরত্ব ছিল মাত্র পঞ্চাশ মাইলের মতো। সমতলে এই পথ যে কোনো সাধারণ পদযাত্রী তিনদিনে শেষ করতে পারে। বাসপথ থাকলে তো এক দিনেই অক্লেশে পৌছনো যায়।

এ অভিযানে আমাদের মোট খরচ হয়েছিল পাঁচ হাজার দুশো টাকা।

খরচের মোটামুটি হিসেবটা হল—চারজন অভিযাত্রীর কলকাতা থেকে কাঠগোদাম পর্যন্ত রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াত ভাড়া। ছু'জন সদস্য রেলকর্মী বলে তারা তাদের রেলের পাসে বিনে ভাড়ায় গিয়েছিল। ছয়জনের বাসভাড়া কাঠগোদাম থেকে কাপকোট-পর্যন্ত যাতায়াত এবং বাসে খাত্তদ্রব্য ও মালপত্রের ভাড়া। দার্জিলিংয়ের মাউন্টেনীয়ারিং ইনষ্টিটিউট থেকে সাজ-সরঞ্জাম আনা হয়েছিল তার ভাড়া প্রায় হাজার টাকা। সদস্যদের তিরিশ দিনের খাওয়ার খরচ মিলিয়ে পড়েছিল মোট প্রায় ছু'হাজার ছুশো টাকা আর বাকি তিন হাজার টাকা লেগেছিল মালবাহকদের মাইনে এবং খাওয়ার জন্য। তিরিশ দিনের অভিযানে বিশজন মালবাহক আমাদের সঙ্গে ছিল বিশ দিন। ওদের সাত টাকা করে রোজ দিয়েছিলাম প্রায় ছু'হাজার পাঁচশো টাকা এবং এক এক জনের প্রতিদিন এক কিলো চাল-আটা এবং তরিতরকারী, মসলাপাতি, চা-চিনি-ছুধ ইত্যাদিতে খরচ পড়েছিল প্রায় পনেরশো টাকা।

ওপরের হিসেব থেকে সহজেই বোঝা যায় হিমালয়ে যে কোনো অভিযান অর্ধেক পয়সায় করা যায়, যদি যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয়।

ইওরোপের মতো না হলেও ইদানীং ভারতের বহু প্রদেশের জন-সাধারণ পর্বতারোহণ তাৎপর্য উপলব্ধি করছেন এবং হিমালয় ভ্রমণও পর্বতারোহণের জনপ্রিয় ক্রীড়ায় স্বীকৃতিলাভ করছে।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বাঙ্গালী আজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের সুদূর হিমালয়ে গিয়ে পর্বতারোহণের মতো ব্যয়সাধ্য ক্রীড়া প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়া প্রায় ছুরূহ। তাই ইচ্ছে এবং উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে মনের সাধ মেটাতে পারছে না। ফলে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় অনেক তরুণ-তরুণীর ঐকান্তিক ইচ্ছার অপমৃত্যু ঘটছে।

পর্বতাভিযানের হাতির খরচ বহন করার ক্ষমতা আমাদের সবার

নেই, অথচ এ-ধরণের ক্রীড়া ভাল লাগে, তখন আমার মনে হয় শৈলারোহণকে যদি সার্বজনীন ক্রীড়ার পর্যায়ে নিয়ে আসা যায় তাহলে অর্থও বাঁচে এবং মনের সাধও মেটে।

শৈলারোহণে আছে ভরপুর রোমাঞ্চ অথচ খরচ অতি নগণ্য। ক'দিন ঘরের বাইরে বেড়িয়ে আসতে যে খরচ হয় তার চেয়েও অল্প খরচে শৈলারোহণ করা যায়। কারণ শৈলারোহণ করার জন্য আমাদের হিমালয়ে যেতে হবে না। ঘরের কাছেই অনেক পাহাড় আছে যেখানে শৈলারোহণ শিক্ষাক্রমের আয়োজন করে আসছেন কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশিষ্ট পর্বতারোহী সংস্থা। পর্বতারোহণ এবং হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শৈলারোহণও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সে কথায় আসছি এবার।

আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের বাঁকুড়া আর পুরুলিয়ায় কিন্তু অনেকগুলো ভাল পাহাড় আছে। সেখানে আছে চমৎকার রক্। শিক্ষার্থীদের জন্য তো আদর্শ বটেই—অভিজ্ঞদের প্রাকটিশ করার জন্যও কম আদর্শ নয়।

বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় খুবই প্রাচীন। এর বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা আজ সেই গণ্ডগ্রাম অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা তন্ময় সাধনায় বিস্মৃত অতীতের কুহেলিকা-ঢাকা অমূল্য সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা করে চলেছেন। পাশে পাশে চলেছে পর্বতারোহীদের শৈলারোহণ শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা।

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতার হিমালয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং নন্দাঘুন্টি পর্বত অভিযানের সফল নেতা শ্রীসুকুমার রায় শুশুনিয়া পাহাড়ের বিচিত্র রক্ ফেসটি খুঁজে বার করেন। তারপর ওখানে শুরু হয় শৈলারোহণের

শিক্ষা শিবির। শ্রী রায়ের সার্থক অনুসন্ধান আজ বাঙ্গলা দেশের শৈলারোহণে নব জাগরণ এনেছে। বিভিন্ন দল ওখানে ছুটেছেন নতুনদের শেখাবার জন্য। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তরুণ-তরুণী পর্বতারোহণের প্রথম পাঠ নিতে আসছে শুশুনিয়ায়। এর জন্য আর একটি মহৎ ক্রীড়া প্রেমিক শ্রীজগন্নাথ কোলে মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাতে হয়। কারণ, তাঁর একদিনের পোড়ো বাংলোটি আজ বাঙ্গলার তরুণ-তরুণীর কলকাকলীতে ভরে গেছে। এখানে বাংলোটি না থাকলে হয়তো এই নব জাগরণের জোয়ার আসত না।

শালবন ঘেরা শুশুনিয়া পাহাড়ের উচ্চতা যদিও খুব বেশী নয়। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় আছে চমৎকার শিলাখণ্ড (রক্ ফেস)। বিভিন্ন রকমের সেই শিলাখণ্ডে প্রাথমিক শৈলারোহণের কায়দা শেখানো যায়। যাদের এই ট্রেনিং নেওয়া আছে তারা এখানে কঠিন শিলায় প্র্যাকটিশ করতে পারে।

বিশেষ করে যারা পর্বতারোহী হতে চায় তাদের শৈলারোহণ খুব ভালোভাবে রপ্ত করা উচিত। ভালো রক্ ক্লাইমার ছাড়া ভালো পর্বতারোহী হওয়া যায় না।

আমাদের দেশের পর্বতারোহীদের মধ্যে ভালো রক্ ক্লাইমার খুবই সামান্য। তাদের নাম হাতের আঙ্গুলে গুণে বলে দেওয়া যায়। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রায় সব পর্বতারোহীই ভালো শৈলারোহী।

পর্বতারোহীদের ভালো শৈলারোহী হতে হলে সুযোগ পেলেই অভ্যাস করা দরকার। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে উইক-এণ্ডে শৈলারোহণ অভ্যাস করা যেতে পারে। মাত্র এক রাতের রেল ভ্রমণ করলেই শুশুনিয়ায় পৌছনো যায়। গ্রামে সস্তায় খাবার পেতে কোনো অসুবিধে নেই। রান্নার সামান্য সরঞ্জাম নিয়ে ছোট দল করে ওখানে গিয়ে ছুটির দিনগুলো শৈলারোহণ অভ্যাস করা যায়। বাঁকুড়া জেলার আশপাশ থেকে অনেকেই ছুটির দিন শুশুনিয়ায়

আসেন বনভোজনে। শাল গাছের প্রলম্বিত ছায়ায় অনেকেই অলস ছুটির দিনগুলো উপভোগ করেন। সামান্য খরচে পাহাড়ের এমন সান্নিধ্য আর কোথায় পাওয়া যাবে!

পুরুলিয়া জেলার আদ্রা রেল স্টেশনের সাড়ে তিন মাইল দূরে জয়চণ্ডী পাহাড়। রেল স্টেশনে দাঁড়ালে জয়চণ্ডী পাহাড় দর্শকের নজর কাড়ে আগে। পাহাড়ের নিচে প্রাচীন জয়চণ্ডী গ্রাম। পাহাড়ের ওপর জয়চণ্ডী দেবীর মন্দির।

নানা কাজে বেশ কয়েকবার আদ্রায় গিয়েছি। দূর থেকে জয়চণ্ডী পাহাড় দেখে আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম।
জয়চণ্ডী পাহাড় অঞ্চল অনুসন্ধান করে দেখি, ওখানে শৈলারোহণের উপযোগী চমৎকার 'রক্ ফেস' রয়েছে। এমন কি পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটা মাঝারী চিমনিও আছে। এখানে শুশুনিয়া পাহাড়ের মতো ভালো এবং বিভিন্ন ধরনের রক্ ফেস না থাকলেও শিক্ষার্থীদের জন্য মোটামুটি ভালোই।

পাহাড় সংলগ্ন জয়চণ্ডী গ্রাম বেশ বর্ধিষ্ণু। খাদ্য পানীয় এবং রাত কাটাবার মতো আশ্রয় আছে। তাছাড়া কাছেই রেল স্টেশন এবং হাসপাতাল থাকায় জয়চণ্ডী আদর্শ শৈলারোহণ শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

সে বছরই কলকাতার মাউন্টেনীয়ারস ক্লাব জয়চণ্ডী পাহাড়ে তাদের বার্ষিক শৈলারোহণ শিক্ষাক্রম চালু করে প্রথম। তারপর থেকে বিভিন্ন ক্লাব ওখানে শৈলারোহণ শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছে। আসানসোলের মাউন্টেন লাভার্স এ্যাসোসিয়েশন তাঁদের শৈলারোহণ শিক্ষাক্রমের গোড়াপত্তন ওখানেই করেছেন।

কলকাতা থেকে মাত্র দুশো মাইলের মধ্যে এমন চমৎকার দুটি পাহাড় আমাদের রয়েছে যেখানে ইওরোপ এবং জাপানের মতো আমাদের দেশের তরুণেরা 'উইক এণ্ড' রক্ ক্লাইমিং ক্রীড়ায় অনায়াসে মেতে উঠতে পারে।

পর্বতারোহণ ও শৈলারোহণ খুবই শ্রমসাধ্য ক্রীড়া। এ ক্রীড়ায় মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার যেমন প্রয়োজন তেমনই সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকা চাই। কেবল মাত্র শারীরিক সুস্থ মানুষ ভালো পর্বতারোহী অথবা শৈলারোহী হতে পারে না, যদি না তার মানসিক সুস্থতা এবং আত্মবিশ্বাস থাকে। অবশ্য সাহস এবং আত্মবিশ্বাস সবার সমান থাকে না। কারো কম কারো বেশি। বারবার অনুশীলনে সাহস বাড়ে এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে।

প্রাথমিক পর্যায়ে যে কোনো শিক্ষার্থীর দেওয়ালের মতো খাড়া শৈলপ্রাচীর দেখে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। শিলাখণ্ড দেখার আগে যে সাহস এবং আত্মবিশ্বাস থাকে তা দেখার পর সেই সাহস হারিয়ে যায় অনেকের।

অল্প উচ্চতার বিভিন্ন আকারের শিলাখণ্ডে নিয়মিত আরোহণ অবরোহণ অভ্যাস করতে করতে মনের ভয় কেটে যায়। একবার মন থেকে ভয় কাটাতে পারলে কঠিন শিলায় ওঠার সময় সাহস এসে যায় স্বাভাবিকভাবে। অভ্যাসের আগে যে শৈলপ্রাচীর দেখে আরোহীর শ্বাসরোধ হয়ে আসে, অভ্যাসের ফলে আর সে ভয় হয় না। তখন সাহসের সঙ্গে যে কোনা কঠিনপাথুরে দেওয়াল অবলীলাক্রমে অতিক্রম করা যায়।

হিমালয় পর্বতে যে সব অভিযান হয় তাতে শুধুই যে বরফ আর সহজ শৈলপথ পাওয়া যায়, তা নয়। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অনেক পর্বত শিখরের বেশ কিছুটা অংশ শৈলপ্রাচীর। যে অভিযাত্রী দলে শৈলারোহী নেই, সেই দল অন্য পথ খোঁজে—যে পথে কোনো শৈলারোহণের দরকার নেই। এতে করে অভিযান বিলম্বিত হয়। অভিযান বিলম্বিত হলে খরচও বাড়ে আর আবহাওয়া বেশীদিন ভালো না পাওয়া গেলে অভিযান পরিত্যক্ত হয়।

অভিযান পরিত্যক্ত হোক এটা কোনো পর্বতারোহী চান না। কিন্তু শৈলারোহণের শিক্ষা এবং অভ্যাসের অভাবে বাধ্য হয়ে তাঁদের

পরাজয় মেনে নিতে হয়। এবং তখন অধিকাংশ দলকে 'পথ ভীষণ দুর্গম' অথবা 'আবহাওয়ার' দোহাই দিয়ে মুখ রক্ষা করতে হয়।

ভালোভাবে শৈলারোহণ রপ্ত করা থাকলে এই সব অসুবিধার সামনে পর্বতারোহীকে বিব্রত হতে হয় না। পর্বতারোহণের আনন্দটাও পুরোপুরি ভোগ করা যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পর্বতারোহীদের সঙ্গে সমান তালে যদিও চলার মতো অবস্থায় আজও আমরা আসতে পারিনি, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। অনেকের ধারণা, ভারতীয় অভিযাত্রীরা যখন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর এভারেষ্ট আরোহণের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তখন বুঝি আমরাও বিরাট পর্বতারোহী হয়ে গেছি। মোটেই নয়। এভারেষ্টের শীর্ষারোহণ যথেষ্ট কৃতিত্বের সন্দেহ নেই। কিন্তু এভারেষ্টের চেয়ে কম উচ্চতার বহু পর্বত শিখর আছে, যেগুলোর শীর্ষে পৌঁছবার চেষ্টা আমাদের পর্বতারোহীরা আজও করেনি। এর কারণ, সেই কম উচ্চতার পর্বতশৃঙ্গগুলি ভীষণ কঠিন। সেগুলির শীর্ষে ওঠার কলা-কৌশল আমরা আজও রপ্ত করে উঠতে পারিনি।

পর্বতারোহণের সূক্ষ্ম কলাকৌশল শেখার এবং তা অনুশীলন করার সব থেকে সস্তা এবং সহজতম উপায় শৈলারোহণ শিক্ষা এবং বার-বার অভ্যাস করে তা রপ্ত করা।

আজ পর্বতারোহণ যখন সাধারণ খেলাধূলার পর্যায়ে এসে গেছে তখন নতুনদের শুরু থেকে শৈলারোহণ শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

॥ তিন ॥

সাজ-সরঞ্জাম (Equipment)

শৈলারোহণ এবং পর্বতারোহণের সঙ্গে সাজ-সরঞ্জাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ছাড়া শৈলারোহণ অথবা পর্বতারোহণ প্রায় অসম্ভব।

অধুনা আমাদের দেশের কিছু কিছু ব্যবসায়ী সংস্থা পর্বত অভিযানের প্রয়োজনীয় বিশেষ সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করছেন। দেশী কারিগরের তৈরি এই সব সরঞ্জামের উপযোগিতা পরীক্ষিত হয়েছে বিভিন্ন পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রে।

সাধারণ একজন শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষণপ্রাপ্ত পর্বতারোহীর পক্ষে নিজের প্রয়োজনীয় সব সাজ-সরঞ্জাম কেনা ব্যয়সাধ্য। তাই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কিছু সাজ-সরঞ্জাম ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে সামান্য ভাড়ায় শৈলারোহণ ও পর্বতারোহণের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম নেওয়া যায়।

এই কলকাতা শহরে এবং পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল সহর আসানসোল ও দুর্গাপুর অঞ্চলের কয়েকটি ক্লাবে পর্বতাভিযানের সরঞ্জাম-ভাণ্ডার আছে। সেখান থেকে তাদের সদস্যরা সামান্য ভাড়ায় সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে। অল্পবিত্ত শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণপ্রাপ্তদের বিশেষ উপকার হয়।

তবে চেষ্টা করলে সামান্য কয়েকটি সরঞ্জাম অনেকেই কিনতে পারে। এবং ইচ্ছা মতো শৈলারোহণ ক্রীড়ায় অংশ নিতে পারে অবসর সময়ে।

বিশেষ সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে প্রথমে জুতোর কথা আলোচনা করবো।

পাহাড় পর্বতে ঘুরতে হলে সবার আগে পায়ের কথা আসে। পায়ে জোর না থাকলে কঠিন পথে ঘোরার কথা চিন্তা করা যায় না। আবার, পায়ের জোর থাকলেই বেরিয়ে পড়া যায় না। দরকার সেই পদযুগলকে রক্ষা করার মতো জুতোর। সব জুতো তো আর পাহাড় জংগলে চলে না। তার জন্য দরকার বিশেষ ধরণের জুতোর।

বাটার হাণ্টার জুতো সেই বিশেষ অর্থে আসে। হাণ্টার পায়ে দিয়ে যেমন জংগলে নিরাপদে চলা যায়, তেমনই আবার পাহাড়েও চলা যায়। এর উপযোগিতা অবশ্য তুষার অঞ্চলের নিচ পর্যন্ত। তুষার আর বরফে হাণ্টার জুতো চলে না একেবারেই। বরফে দরকার ক্লাইমিং বুটের। আমাদের দেশে এই বুট প্রথম বাটা কোম্পানী বানিয়েছে। ভারতীয় এভারেষ্ট অভিযাত্রীরা এই বুট পায়ে দিয়েই পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শিখর আরোহণ করেছেন এবং নিরাপদেই ফিরে এসেছেন। আজ কাল অবশ্য অন্য কয়েকটি সংস্থা ক্লাইমিং বুট বানাচ্ছে।

ক্লাইমিং বুট ছাড়াও হালকা ধরনের এ্যাপ্রোচ-মার্চ বুট পাওয়া যায়। চামড়া এবং রাবারের তৈরি এই বুট কঠিন পাথুরে পথে চলার পক্ষে খুবই উপযোগী। এ্যাপ্রোচ-মার্চ বুট পরে তুষারেও হাঁটা-চলা করা যায়। আমরা এই বুট পরে উনিশ হাজার ফুট পর্যন্ত আরোহণ করে দেখেছি এর উপযোগিতা। এ বুটও বাটা কোম্পানী তৈরি করে এবং দাম ক্লাইমিং বুটের চেয়ে সস্তা। অবশ্য হাণ্টারের দাম আরো কম। অন্ততঃ একটা হাণ্টার জুতো যে কোনো শিক্ষার্থী কিনতে পারে।

শৈলারোহণ অভ্যাস করার জন্য এক জোড়া কেড্‌সই যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের শুশুনিয়া অথবা জয়চণ্ডী পাহাড়ে কেড্‌স পরে শৈলারোহণ করা চলে। কারণ, শীতকালে এখানে তেমন ঠাণ্ডা পড়ে না যাতে পায়ে ক্র্যাম্প ধরতে পারে। অবশ্য হিমালয়ের অতি-উচ্চতায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কেড্‌স অথবা হাণ্টার অকেজো। সেখানে ক্লাইমিং বুট পায়ে দিয়েই শৈলারোহণ করতে হবে।

জুতো কেনার সময় মাপ সম্বন্ধে খুবই সজাগ থাকতে হবে। শৈলারোহণের জুতো কখনো খুব আলগা অথবা চাপা না হয়। জুতো কেনার সময় অন্ততঃ দু'জোড়া গরম মোজা পরে মাপ ঠিক করা উচিত। মোজা পরার পর জুতো ঠিক ঠিক পায়ের মাপ হলেই তবে সেই জুতা নেওয়া ভালো। তাতে আরোহণ-অবরোহণ করার সময় পায়ের আরাম হবে—পরিশ্রম লাঘব হবে।

প্রতিদিন আরোহণ-অবরোহণ অথবা হাঁটা-চলার পর জুতোর ময়লা পরিষ্কার করা উচিত। এতে আয়ু বাড়বে জুতো এবং পায়ের কোনো ক্ষতি হবে না। নিয়মিত মোজা সাবান জলে পরিষ্কার করা উচিত। না হলে, পায়ের ঘামে নোংরা মোজা পায়ের ক্ষতি সাধন করবে।

মনে রাখতে হবে পর্বতারোহীর পা দুটোই তার সব শক্তির উৎস।

জুতোর পর দেহ আচ্ছাদনের বিশেষ কয়েকটি পোশাক-পরিচ্ছদের কথা বলা প্রয়োজন। পর্বতারোহণের জন্য বেশ কিছু গরম পোশাকের দরকার। কিন্তু শৈলারোহণের জন্য তেমন গরম পোশাক বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের শুশুনিয়া এবং জয়চণ্ডী পাহাড়ে শৈলারোহণ শিক্ষা অথবা অভ্যাস করার জন্য দরকার, সাধারণ সুতির গেঞ্জি, সুতি অথবা ফ্লানেলের ফুল হাতা সার্ট ও ফুল প্যাণ্ট, দু'জোড়া উলের মোজা (হাঁটু পর্যন্ত) এবং মাথায় পরার জন্য বালাক্লাভা ক্যাপ অথবা হনুমান টুপি। গেঞ্জি, সার্ট ও প্যাণ্ট অন্ততঃ এক জোড়া থাকা উচিত। টেরিলিন অথবা টেরিকটের প্যাণ্ট সার্ট শৈলারোহণে কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, দড়ির সাহায্যে অবরোহণ (র‍্যাপেলিং) করার সময় দড়ির ঘর্ষণে টেরিলিন-টেরিকটের কাপড়ে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয়, ফলে ঘর্ষণের স্থানে ফোসকা পড়ে যেতে পারে সহজেই।

শীত বেশি থাকলে ফুলহাতা সোয়েটার একটা দরকার। এর

সঙ্গে যদি এক সেট উইন্‌প্রুফ প্যান্ট আর জ্যাকেট পাওয়া যায় তো সোনায় সোহাগা। সুতি অথবা ফ্লানেলের জামা-প্যান্টের ওপর উইন্‌প্রুফ প্যান্ট আর জ্যাকেট পরে নিলে আরোহণ-অবরোহণের সুবিধে হবে অনেক। পাহাড়ে যদি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া চলে তাতেও শিক্ষার্থীর এতটুকু কষ্ট হবে না। কারণ, ওই বিশেষ জামা প্যান্ট ভেদ করে হাওয়া দেহ স্পর্শ করতে পারে না।

সব শেষে বলি, এক জোড়া দস্তানা, অবশ্যই পশমের তৈরি, নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। দস্তানা যেমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে হাতের স্বাভাবিক উত্তাপ হারাতে দেয় না, তেমনই অবরোহণের সময় অথবা সহ-আরোহীকে দড়ির সাহায্যে আরোহণ-অবরোহণে সাহায্য করার সময় দড়িতে ঘষা লেগে হাতের সম্ভাব্য ক্ষতের প্রতিকার করবে।

মনে রাখা দরকার শৈলারোহণে পায়ের মতো হাতের যত্ন নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আরোহীকে নিজের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এবং পোশাক-পরিচ্ছদ নিজের পিঠে বহন করতে হয়। সব মালপত্র বহন করার জন্য রুক্‌স্যাক্‌ ব্যবহার করা হয়। রুক্‌স্যাক্‌ তৈরি হয় ওয়াটার প্রুফ্‌ কাপড় দিয়ে। বেশ বড়সড় একটা ব্যাগের মতো দেখতে। এতে এক মণ পর্যন্ত মালপত্র ধরে। রুক্‌স্যাকের পিছনে থাকে পিঠে ঝোলানোর বেল্ট বা স্ট্র্যাপ। ভেতরে এবং বাইরে মিলিয়ে চার পাঁচটি পকেট থাকে। এতে টুকি-টাকি মালপত্র রাখা যায় এবং সহজেই বার করা যায়। রুক্‌স্যাক্‌ দু'রকমের। ফ্রেম লাগানো এবং ফ্রেম ছাড়া। এ্যালয় দিয়ে তৈরি ফ্রেম লাগানো রুক্‌স্যাক্‌ পর্বত অভিযানের জন্য উপযোগী হলেও শৈলারোহণের পক্ষে বিপজ্জনক। শিলায় আরোহণ-আবরোহণের সময় শিলার গায়ে এই ফ্রেম বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে, ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ফ্রেম বিহীন রুক্‌স্যাকে এ-ধরণের কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা নেই। তাই শৈলারোহণের সময় শৈলারোহীর ফ্রেম ছাড়া রুক্‌স্যাক্‌ ব্যবহার করা উচিত।

হিমালয়ে পর্বত অভিযানের জন্য কিছু বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিছানাপত্রের প্রয়োজন।

উপরে বর্ণিত পোশাক-পরিচ্ছদ সমতলে শীতকালে চলে গেলেও হিমালয়ের সুউচ্চ অঞ্চলের প্রচণ্ড শীতে আরো কিছু পোশাক দরকার দেহের উত্তাপ রাখার জন্য। না হলে, শীতে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

সেই সব বিশেষ পোষাক হল,—পাখির নরম পালক আর হাওয়া নিরোধক নাইলনের কাপড়ে তৈরি ফেদার কোট ও প্যাণ্ট। ফেদার কোটের সঙ্গে লাগানো হেড-গিয়ার দিয়ে মাথা কান ঢাকা যায়। এ পোশাক সাধারণত মূল শিবির থেকে উপরের যে কোনো উচ্চতা পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। ফেদার কোট-প্যাণ্ট ভেদ করে ঠাণ্ডা হাওয়া দেহ স্পর্শ করতে পারে না।

ফেদার কোট এবং প্যাণ্টের বিকল্প হিসাবে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা দফতরের পোশাক-পরিচ্ছদ বিভাগ এক প্রকারের সিন্থেটিক ব্যবহার করছে পাখির পালকের পরিবর্তে। সেই পোষাকের অন্তর এবং বর্হিভাগে নাইলনের কাপড় এবং মাঝখানে সিন্থেটিক বস্তু লাগানো থাকে পালকের পরিবর্তে। এই পোশাক দেহে যথেষ্ট উত্তাপ দিলেও সতেরো আঠারো হাজার ফুটের ওপরে মোটেই কার্যকরী হয় না। তাছাড়া এর ওজনও ফেদার কোট প্যাণ্টের চেয়ে অনেক বেশি। ছোটখাটো পর্বত অভিযান এবং হিমালয় ভ্রমণে (ট্রেকিং) এই পোশাক দিয়ে কাজ চালানো যায় ভালোই। পালকের তৈরি পোশাকের চেয়ে এর দামও অনেক কম। আমাদের সৈন্য বাহিনীর জওয়ানরা এ পোশাক পরেই হিমালয়ের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সঙ্গে লড়াই করছে—অতন্দ্র প্রহরা দিচ্ছে সীমান্তে।

বায়ু নিরোধক পোশাক—উইন্‌প্রুফ ট্রাউজার ও জ্যাকেটের কথা আগেই বলেছি। এ পোশাক শৈলারোহণ এবং পর্বতারোহণের জন্য সমান উপযোগী। ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো শত্রু আর কেউ নেই।

আরোহণ এবং অবরোহণের সময় ঠাণ্ডা হাওয়া পর্বতারোহীর সব এনার্জী শেষ করে দেয়। হাত পা ঠাণ্ডায় শিথিল হয়ে যায়। ফলে আরোহীর কর্মক্ষমতা লোপ পায়। তাই বায়ুর বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে সাবধান হতে হয়। বায়ু নিরোধক পোশাকের প্রয়োজনীয়তা তাই এত বেশি।

উইন্‌প্রুফ পোশাকের কাপড় সাধারণত মোটা নাইলনের সুতোয় বোনা হয়। যাতে সামান্য বায়ু ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। জ্যাকেট এবং ট্রাউজার বেশ বড়সড় হওয়া উচিত। কারণ এ পোশাক সব জামা কাপড় পরার পর পরতে হয় বলে যথেষ্ট বড় হওয়া দরকার। জ্যাকেটের ঝুল অন্ততঃ হাঁটুর নিচে নামা চাই। যাতে বসার সময় প্যাণ্টের কিছুটা ঢাকা থাকে। ভেজা জমি অথবা বরফের ওপর বসলেও প্যাণ্ট ভিজবে না। জ্যাকেটের অনেকগুলো পকেট থাকে। বুকের ওপর চেন লাগানো পকেটটিকে 'ম্যাপ-পকেট' বলে। ওখানে ম্যাপ এবং কম্পাস সযত্নে রাখা যায়। আরও গোটা চারেক পকেট থাকে টুকিটাকি জিনিষ পত্র রাখার জন্য। গলা থেকে বুক পর্যন্ত চেন থাকে। চেন প্রয়োজনে টেনে দিলে গলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। জ্যাকেটের সঙ্গে সেলাই করা হেড-গিয়ার দিয়ে কান মাথা ঢাকা যায়। কোমরে একটা সরু দড়ি থাকে—সেটা টেনে বাঁধলে আর বায়ু প্রবেশের কোনো পথই থাকে না।

ট্রাউজার অনেকটা ঢলঢলে পায়জামার মতো। পায়ে এবং কোমরে সরু দড়ি লাগানো থাকে। পায়ের গোছে এবং কোমরে দড়ি বেঁধে নিলে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না।

পশমের মোজা শৈলারোহণে এবং পর্বতারোহণে সমান প্রয়োজনীয়তা। অন্তত দু'জোড়া হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পশমের মোজা এবং পায়ের গোছ পর্যন্ত ছোট মোজা থাকা দরকার। এ্যাপ্রোচ বুট অথবা স্নো ক্লাইমিং বুট পরার সময় আগে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা মোজা পরে তার ওপর হাফ্ মোজা পরা উচিত। পথ

চলার সময় যদি ছোট কাঁকর বা পাথর জুতোর মধ্যে ঢুকে যায় তা ওই ছোট মোজা পায়ের কষ্টকে রেহাই দেবে। বরফে চলার সময় বরফের কুঁচি ঢুকে পায়ের বিপদ ঘটাতে পারে। সেক্ষেত্রে ছোট মোজা প্রথম ভিজে গলেও বড় মোজার উত্তাপ অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারে। দু'চার জোড়া বাড়তি মোজা মজুত রাখতে পারলে ভালোই হয়।

মোজা আর জুতোয় সব সময় পায়ের যত্ন নেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে নরম তুষারে বিপদ যে কোথা দিয়ে কখন আসবে কেউ বলতে পারে না। খুব বেশি নরম বরফে হাফ্ মোজা আর কতক্ষণ ফুল মোজার উত্তাপ বজায় রাখবে! এক সময় দু'জোড়া মোজাই ভিজে যাবে। পায়ের ওজন তখন ডবল, তিন-ডবল হয়ে উঠবে। সময় মতো মোজা বদল করতে না পারলে পায়ে তুষারক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর বড়সড় ক্ষত সৃষ্টি হলে পা বাদ দিতেও হতে পারে। একেই 'ফ্রস্ট বাইট' বলে। ফ্রস্ট বাইটকে প্রতিটি পর্বতারোহী যমের মতো ভয় করে।

গ্যেটার অথবা বুট কভার ব্যবহার করলে জুতোর মধ্যে বরফ ঢুকতে পারবে না এবং তুষারক্ষতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

গ্যেটার এবং বুট কভার নাইলনের মোটা কাপড় অথবা জল নিরোধক ক্যানভাস দিয়ে তৈরি। গ্যেটার দিয়ে কেবল জতোর লেসের ফাঁকা অংশটা ঢাকা যায়। এতে নরম বরফে চলা ফেরায় তেমন অসুবিধা হয় না। কিন্তু নরম বরফ যদি বেশি থাকে অর্থাৎ হাঁটু পর্যন্ত ডোবা বরফ থাকে, তাহলে গ্যেটারে কাজ চলবে না। তখন বুট কভার ব্যবহার করতে হবে। বুট কভার জুতোর ওপর দিয়ে পরতে হয়। এটি হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। ফলে কোনো প্রকারেই পায়ে বরফ প্রবেশ করতে পারে না।

শক্ত বরফে চলা ফেরার জন্য জুতোর নিচে কাঁটা ব্যবহার করতে হয়। পর্বতারোহীদের জুতোর কাঁটাকে ক্র্যাম্পন (crampon) বলে।

ক্র্যাম্পন লোহা অথবা এলয়ের তৈরি হতে পারে। অ্যালুমিনিয়ামের ক্র্যাম্পন যেমন হালকা তেমনই মজবুত। কঠিন বরফে ক্র্যাম্পন লাগানো বুট পরে চললে পা পিছলে যাবার আশংকা থাকে না।

পোশাক-পরিচ্ছদের পর দরকার বিছানা। সারাদিনের ক্লান্তিকর আরোহণ-অবরোহণের পর বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। আরামে বিশ্রাম নিতে গেলেই বিছানার কথা এসে পড়ে। পর্বতারোহণে বিছানাও বিশেষ ধরণের হয়। ওজন কমাবার দিকে দৃষ্টি রেখেই হালকা অথচ আরামের বিছানা আবিষ্কার করে গেছেন পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম নির্মাতারা। আর তা হল ঘুমাবার থলি অর্থাৎ স্লিপিং ব্যাগ আর বায়ু পূর্ণ রাবারের গদি—এয়ার ম্যাট্রেস।

স্লিপিং ব্যাগ নাইলনের কাপড় দিয়ে তৈরি। অনেকটা লেপের মতো। লেপের মধ্যে যেমন থাকে তুলো এতে থাকে পাখির হালকা পালক। পা থেকে গলা পর্যন্ত থলির মতো সেলাই করা। মাথা ঢাকার জন্য হেড-গিয়ারও জোড়া থাকে। পা থেকে গলা পর্যন্ত লম্বা একটা চেন লাগানো থাকে। ব্যাগে ঢুকে চেন টেনে দিলে আর ঠাণ্ডা প্রবেশ করতে পারে না। শরীরের পূর্ণ উত্তাপ এই ব্যাগের অভ্যন্তরেই ধরে রাখা যায়। পালকের বদলে সিন্থেটিক ফাইবার দিয়েও স্লিপিং ব্যাগ তৈরি হচ্ছে। গরম তাতেও কম থাকে না। তবে ষোল-সতেরো হাজার ফুটের ওপর এগুলি অচল। পাখির পালক বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় বলে দাম বেশি পড়ে। কিন্তু দেশজ বস্তুতে তৈরি সিন্থেটিক ফাইবারের শিল্পিং ব্যাগ সস্তা এবং ট্রেকিং অথবা ছোটখাটো অভিযানে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এয়ার ম্যাট্রেস তৈরি করা হয় রাবার দিয়ে। এয়ার পিলোর মতোই দেখতে। এয়ার ম্যাট্রেস একজন পরিপূর্ণ মানুষের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী তৈরি হয়। এতে মাথার বালিশ এবং শয়নেব গদি থাকে। হাওয়া পুরে নিলে বেশ আরাম-দায়ক গদি তৈরি হয়ে যায়। এই গদির ওপর স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে শয়ন করতে হয়। এয়ার ম্যাট্রেসের

ওজনও খুবই অল্প। তাই এর উপযোগিতা অনেক। যে কোনো স্থানে অর্থাৎ মাটিতে পাথরে কিংবা বরফে ব্যবহার করা যায়। নিচু থেকে ঠাণ্ডা উঠতে পারে না। ওজন কম বলে রুক্স্যাকে বহন করা যায়।

একটা শ্লিপিং ব্যাগ আর একটা এয়ার ম্যাট্রেসই হল পর্বতারোহীর আদর্শ বিছানা।

পর্বতারোহণ এবং শৈলারোহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ সাজ-সরঞ্জামের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথায় আসি এবার।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাঁচানোর পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতো এবং বিছানার আলোচনা করেছি। এগুলি বহন করে নিয়ে যাবার মতো ব্যাগ অর্থাৎ রুক্স্যাকের আলোচনাও করা হয়েছে। পাহাড় পর্বতের দুর্গম অঞ্চলে ভ্রমণ এবং আরোহণ-অবরোহণের জন্য কিছু বিশেষ সাজ-সরঞ্জাম দরকার হয়। সেগুলি হল, দড়ি, স্লিং, ক্যারাবিনার, রক্ পিটন, আইস পিটন, পিটন হ্যামার, আইস এ্যাক্স, হ্যামার এ্যাক্স, গ্লাভ্স, ওয়্যর এবং রোপ-ল্যাডার ইত্যাদি।

দড়ি—শৈলারোহী অথবা পর্বতারোহীর জীবন-রেখা বা লাইফ-লাইন হল দড়ি। একটি দড়িতে দু'জন কিংবা তিনজন পর্বাতারোহীর প্রাণ পাখিকে নিরাপদে রাখে। একজন বিপদে পড়লে যাতে অপর জন তাকে সাহায্য করতে পারে, তাই দড়ির এত কদর। আর এ কারণেই দড়িকে পর্বতারোহীর জীবন-রেখা বলা হয়েছে। দড়ির দু'প্রান্তে দু'জন আরোহী আবদ্ধ হবাব পর তাদের আলাদা অস্তিত্ব থাকে না। তখন তারা এক এবং অদ্বিতীয়।

নাইলন অথবা ম্যানিলার আঁশ দিয়ে তৈরি দড়ি শৈলারোহণ ও পর্বতারোহণের কাজে ব্যবহৃত হয়। ম্যানিলার চেয়ে নাইলন দড়ি খুবই উপযোগী। ম্যানিলার আঁশ দিয়ে তৈরি দড়ি যেমন ভারী তেমনই মজবুত। খুশিমতো দড়ির ফাঁস বানানো অথবা গোল

করে গোটানোর কিছু অসুবিধা হয়। নাইলন দড়ি ম্যানিলার তুলনায় খুবই হালকা এবং নরম। যেমন ইচ্ছা ফাঁস লাগানো এবং গোটানো যায় সহজেই। ম্যানিলার চেয়ে নাইলনের দড়ি জলে ভিজে গেলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে নেওয়া যায়। নাইলনের দড়ি খুবই টেঁকসই। এ সব উপযোগিতা থাকায় নাইলনের দড়ি শৈলারোহী এবং পর্বতারোহীর কাছে খুবই প্রিয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইটালিয়ান আঁশ এবং ম্যানিলা আঁশের তৈরি দড়ির চলন ছিল খুব। তখন অন্য কোনো আঁশের দড়ি উপযুক্ত মনে করা হতো না। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পর নাইলনের দড়ি আবিষ্কারের পর আগেকার প্রচলিত দড়ি আর কেউই পছন্দ করে না। অবশ্য ওয়েষ্ট-ব্যাণ্ড অর্থাৎ কোমরে জড়াবার টুকরো দড়ি হিসাবে ম্যানিলার কদর আজও আছে।

পর্বতারোহণ এবং শৈলারোহণের দড়ি বাছাই করার সময় নজর রাখতে হবে যেন ব্যবহারের দড়ি খুবই মজবুত হয়। এখানে মজবুত অর্থে দড়ির সম্পূর্ণ ভার বহনের ক্ষমতা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সহ্য করার ক্ষমতা দড়িটির থাকা চাই। আরোহণ কালে কোনো আরোহী যদি হাত-পা ফসকে পড়ে যায় এবং সেই পতনজনিত প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে মজবুত দড়ি ছেঁড়ে না। ভালো দড়ি পাহাড়ের ধারালো অংশে ঘষা খেলেও ছিঁড়ে যায় না। তাছাড়া দড়ির সম্প্রসারণ ক্ষমতা (extensibility) থাকা উচিত। দড়ির সম্প্রসারণ ক্ষমতা থাকলে তা সহজে ছিঁড়ে যায় না, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সত্ত্বেও। দড়ি হালকা হওয়া উচিত। হালকা ওজনের দড়ি সহজে বহন করা যায়।

বর্তমানে দু'প্রকারের দড়ির বহুল প্রচলন। পাক দেওয়া দড়ি বা কেব্‌ল্‌ড রোপ এবং ক্যার্‌ন্‌ম্যান্‌টেল রোপ।

কেব্‌ল্‌ড রোপ (Cabled Rope)—অনেকগুলো নাইলন সূতোর তন্তু দিয়ে এক একটা গোছা বানানো হয়, তারপর এ রকম তিনটি সূতোর গোছা একত্রে পাকিয়ে কেব্‌ল্‌ড রোপ তৈরি করা

হয়। এ দড়ি যেমন মজবুত তেমনই এর সম্প্রসারণ ক্ষমতা। টেঁকেও অনেক দিন।

ক্যারন্ম্যান্টেল রোপ (Kernmantel Rope)—মজবুত নাইলনের সুতোর তৈরি খোলের মধ্যে অনেকগুলি নাইলনের লম্বা লম্বা তন্তু পোরা থাকে। তন্তুগুলি দড়ির সম্পূর্ণ দৈর্ঘের মাপে প্রস্তুত হয়। ক্যারন্ম্যান্টেল দড়ির তন্তু কখনো জোড়া লাগানো হয় না। ফলে দড়ির ভার-বহন ক্ষমতা, সম্প্রসারণশীলতা এবং ধারাল শিলায় ঘষা খাওয়ার প্রচণ্ড ক্ষমতা থাকে। তন্তুগুলি নরম হওয়ায় এই জাতের দড়ি সহসা জড়িয়ে যায় না, যেটা কেব্‌ল্‌ড রোপের ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক। কারণ, কেব্‌ল্‌ড রোপের তন্তুগুলি তেমন নরম নয়। দেখা গেছে যে ক্যারন্ম্যান্টেল রোপ কেব্‌ল্‌ড রোপের চেয়েও অনেক বেশি উপযোগী।

পর্বত অভিযানে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও পরিধির দড়ি ব্যবহার করা হয়।

শৈলারোহণের আদর্শ দড়ি—১২০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১½ ইঞ্চি পরিধি যুক্ত কেব্‌ল্‌ড রোপ। দড়িটির ভার বহন ক্ষমতা ১৯১০ কিলোগ্রাম অথবা ৪২০০ পাউণ্ড, সম্প্রসারণ ক্ষমতা ৪০%। ওজন একটু বেশি—৩ কিলোগ্রাম। এবং দামও অনেক। এই দড়ির পরিবর্তে ১¼ ইঞ্চি পরিধি এবং ১২০ ফুট দৈর্ঘ্যের এক জোড়া দড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে। এক জোড়া দড়ির ওজন একটু বেশি হলেও সুবিধে অনেক। পাহাড়ের ধারাল অংশে ঘষা খেয়ে একটা দড়ি ছিঁড়ে গেলেও অপরটা পতনের হাত থেকে আরোহীকে রক্ষা করবে। ১¼ ইঞ্চি পরিধির দড়ির ওজন ২ কিলো, সম্প্রসারণ ক্ষমতা ৪০% এবং ভার বহনের ক্ষমতা প্রায় ৩৫০০ পাউণ্ড অথবা ১৫৯০ কিলো। একটি দড়ি ১½ ইঞ্চি অথবা এক জোড়া ১¼ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত দড়ি বরফে আরোহণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

শৈলারোহণ এবং পর্বতারোহণের অপর আদর্শ দড়ি হল, ১২০

ফুট দীর্ঘ ১½ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত ক্যারন্‌ম্যান্‌টেল রোপ। এর ওজন তিন কিলোর কিছু কম এবং ভার বহনের ক্ষমতা প্রায় ২২৬০ কিলো অর্থাৎ ৫০০০ পাউণ্ড। এর সম্প্রসারণ ক্ষমতা শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ। ১ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত ক্যারন্‌ম্যান্‌টেল দড়ির ওজন প্রায় দেড় কিলো, ভার বহনের ক্ষমতা ১৬০০ কিলো। সম্প্রসারণ ক্ষমতা শতকরা ৪৫ ভাগ। এ দুটি দড়ি রক্ ফেস এবং বরফে ব্যবহার করা যায় অনায়াসে।

ওপরে যে দড়িগুলির কথা বললাম তা সবই ক্লাইমিং রোপ। ক্লাইমিং রোপ ছাড়াও আছে দ্রুত অবরোহণের দড়ি অর্থাৎ এ্যাব্‌সেলিং রোপ এবং ফিক্‌স্‌ড রোপ। ক্লাইমিং রোপ দিয়ে যেমন এ্যাব্‌সেল অর্থাৎ দ্রুত অবরোহণ করা উচিত নয়, তেমনই ক্লাইমিং এবং এ্যাব্‌সেলিং রোপ দিয়ে ফিক্‌স্‌ড রোপ হিসাবে ব্যবহার অনুচিত। অর্থাৎ যে দড়ি যে কাজের জন্য তা ঠিক ঠিক সেই কাজে ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

দ্রুত অবরোহণের জন্য আদর্শ দড়ি হল ⅞ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত 'কেব্‌ল্‌ড রোপ' অথবা ১ ইঞ্চি পরিধির 'ক্যারন্‌ম্যান্‌টেল রোপ'। উভয় দড়িই এক জোড়া হওয়া চাই। সাধারণত এই দড়ির দৈর্ঘ্য ক্লাইমিং রোপের মতো ১২০ ফুট। কিন্তু অবরোহণের ক্ষেত্র যদি ১২০ ফুটের বেশি হয় তাহলে নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ খুবই সমস্যা হয়ে পড়ে। সে কারণে ২৪০ ফুট অথবা ২৫০ ফুটের দৈর্ঘ্যযুক্ত দড়ি অবরোহণের জন্য ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ২৪০ ফুটের দড়ি বিভিন্ন পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দড়ির স্লিং—ম্যানিলা অথবা নাইলন আঁশের তৈরি দড়ি দিয়েই স্লিং বানানো হয়। যে কোনো শৈলশিরা অথবা কঠিন বরফের দেয়ালে আরোহণ অথবা অবরোহণ এবং দ্রুত-অবরোহণ (এ্যাব্‌সেল) করার জন্য দড়ির তৈরি স্লিং অপরিহার্য্য।

স্লিংয়ের দড়ির দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ১⅞ ইঞ্চি। এটি সবচেয়ে মজবুত স্লিং যাকে পর্বতারোহণের পরিভাষায় বলে, 'ফুল ওয়েট স্লিং'। একই

দৈর্ঘ্যের মাঝারী এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্লিং তৈরি হয় যথাক্রমে ১ৣ ইঞ্চি এবং ⅞ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত দড়ি দিয়ে। উল্লিখিত মাপের দড়ি ক্লাইমিং দড়ি থেকে কেটে বানানো হয়। ১০ ফুট লম্বা দড়ির পরিবর্তে ৫ ফুট করে দুটো দড়ির দু'মুখে ডবল-ফিসারম্যান-নট (গিঁট) লাগিয়েও স্লিং বানানো যায়। এর সুবিধা হল ধারালো পাথরে ঘষা খেয়ে একটা দড়ি কেটে গেলেও অপরটি দিয়ে কাজ চালানো যায়। কিন্তু ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের দড়ির স্লিং এক জায়গায় কাটলেই অকেজো হয়ে যায়।

দড়ির সব শেষটি হল, কোমরে জড়ানোর ওয়েস্ট লাইন। এই দড়ির দৈর্ঘ্য ২০ ফুট এবং পরিধি ⅞ ইঞ্চি। ম্যানিলা অথবা ইটালিয়ান সুতার তন্তু দিয়ে তৈরি দড়ির ওয়েস্ট লাইন সবচেয়ে উপযোগী। দড়িটি কোমরে জড়িয়ে নিয়ে 'রিফ্ নট' দিলেই চলবে। রিফ্ নট লাগাবার পর দড়ির শেষ অংশ দুটি কোমরের দড়ির সঙ্গে পাক দিয়ে নিতে হয়। ওয়েস্ট লাইনে একটি পুরো ওজনের ক্যারাবিনার (স্টীলের দরজাওয়ালা কপিকলের মত) লাগিয়ে নিয়ে বিলে করা যায় নিরাপদে।

ওয়েস্ট লাইনের দড়ি কখনোই নাইলনের হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ওয়েস্ট লাইনের মধ্য দিয়ে নাইলনের দড়ি বিলে করার সময় অথবা হঠাৎ পড়ে যাওয়ার ফলে হ্যাঁচ্কা টানের ঘর্ষণে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয় তাতে নাইলনের ওয়েস্ট লাইন দড়ি জ্বলে যেতে পারে এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ম্যানিলা এবং ইটালিয়ান আঁশের তৈরি দড়িতে এই উত্তাপ সৃষ্টি হয় না।

ক্যারাবিনার (karabiner)—ধাতুর তৈরি বস্তু। দুটি দড়িকে সংযুক্ত করার জন্য ক্যারাবিনার ব্যবহার করা হয়। ইংরাজী 'D' আকারের ক্যারাবিনারে এক দিকে দরজা থাকে। দরজা ভেতরে চাপ দিয়ে খুলতে হয়। দরজা দিয়ে দড়ি ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। দরজার কব্জায় স্প্রিং লাগানো থাকে তাই দড়ি বাইরে

বেরিয়ে আসতে পারে না। স্প্রিংয়ের দরজার অংশ ১৫ মিঃ মিটার থেকে ১৮ মিঃ মিটার দীর্ঘ হওয়া চাই, যাতে মোটা দড়ি সহজে প্রবেশ করানো যায়। দরজার যেদিকে স্প্রিং আছে সেখানে একটি পিন লাগানো থাকে এবং অপর প্রান্তে অর্থাৎ দরজা খোলার মুখে খিল লাগানো থাকে, যাতে দরজা বাইরে বেরিয়ে না আসে। অনেক ক্যারাবিনারে আবার স্ক্রু লাগানো থাকে। স্ক্রু-স্লিভ (Screw-Sleeve) ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করা যায়। এতে দড়ি লাফিয়ে অথবা পিছলে বেরিয়ে এসে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে না।

ক্যারাবিনার সাধারণত ভালো জাতের স্টীল দিয়ে তৈরি করা হয়। সবচেয়ে ভালো এবং মজবুত ক্যারাবিনার তৈরি হয় টেম্পার দেওয়া এ্যালয় অথবা কার্বন স্টীলে। সহজে মরচে না ধরার ব্যবস্থাও করা থাকে। এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় দিয়ে তৈরি ক্যারাবিনার ওজনে খুবই হালকা এবং এর উপযোগিতা আগেরগুলির মতো।

ক্যারাবিনার ভারী এবং হালকা দু রকমের হয়। ভারী ক্যারা-বিনারের ওজন ½ পাউণ্ড বা ২২৭ গ্রামে এবং হালকা ¼ পাউণ্ড বা ১১৪ গ্রামে। এদের নানান আকারে তৈরি করা হয়। ভারী ক্যারাবিনার মোট ৪৮২০ পাউণ্ড বা ২২০০ কিলো এবং হালকা ১৩২০ পাউণ্ড বা ৬০০ কিলো ভার বহন করতে সক্ষম।

রক্ ও আইস পিটন—শিলা এবং শক্ত বরফে ব্যবহার করার লোহার প্রেক বা গজাল। উচ্চ সম্প্রসারণ ক্ষমতার এ্যালয়-স্টীল দিয়ে তৈরি পিটন সবচেয়ে উপযোগী।

শিলার ফাটলের বিভিন্নতার জন্য নানা আকারের পিটন ব্যবহার করা হয়।

খুব সূক্ষ্ম ফাটলের জন্য পাতলা ব্লেডযুক্ত লিফ (leaf) পিটন এবং চওড়া ফাটলের জন্য ইংরাজী U আকৃতির চ্যানেল (channel) পিটন ব্যবহার করা হয়। V আকারের পিটনকে বলে ইউনিভার্সাল

(universal)। এ ছাড়া এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয়ের তৈরি মোটা পিটনও ব্যবহৃত হয়। পিটনের মাথা সাধারণত বেশ মোটা। মাথার সামান্য নিচে গোলাকার ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্রকে আই (eye) বলে। আই-এর মধ্য দিয়ে সহজে দড়ি পরানোর জন্য এর ছিদ্রটিকে বেশ বড়সড় করে বানানো হয়।

আইস পিটন প্রায় রক্ পিটনের মতোই, তবে আইস পিটন আরো শক্ত এবং মজবুত স্টীলের তৈরি। রক্ পিটন যেমন পাথরের ফাটল অনুযায়ী এঁকেবেঁকে প্রবেশ করে, আইস পিটনকে তা করতে হয় না। সোজাসুজি ফাটল তৈরি করে প্রবেশ করে বলে খুবই শক্ত স্টীলের হয়।

তিন রকমের আইস পিটন ব্যবহার করা হয়, যেমন, ব্লেড, চ্যানেল এবং টিউবলার। আইস পিটনের ব্লেডে দাঁত কাটা থাকে। শক্ত বরফে হাতুড়ি দিয়ে বসিয়ে দেবার পর এই দাঁতগুলোই পিটনকে বরফের সঙ্গে মজবুত করে ধরে থাকে। রক্ পিটন ৯ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। এরও মাথা এবং ব্লেডের মাঝখানে থাকে একটা বড় ছিদ্র। কিছু কিছু লোহার রিং লাগানো পিটনও ব্যবহৃত হয়।

"আইস স্ক্রু পিটন"—বর্তমানে এই পিটন আইস পিটনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে। পিটনের ব্লেডের বদলে লম্বা স্ক্রু থাকে। মাথায় থাকে খুব বড় ছিদ্র। এই পিটন সহজে শক্ত বরফে লাগানো যায়। সাধারণ পিটন লাগাবার সময় বরফে যে ফাটল সৃষ্টি হয় তার থেকে বরফে ধস নামতে পারে। কিন্তু স্ক্রু পিটনে কোনো ফাটল সৃষ্টি হয় না। স্ক্রু পিটনে ভালো বিলে করা যায়।

"স্নো স্টেইক্" তৈরি হয় এ্যালয় টিউব অথবা এ্যাঙ্গেল দিয়ে। স্নো স্টেইক্ গোলাকার অথবা ত্রিকোণী হতে পারে। এব দৈর্ঘ্য দেড় থেকে দু'ফুট। নরম অথবা শক্ত বরফে "স্নো স্টেইক্" সহজেই হাতুড়ির ঘায়ে প্রবেশ করানো যায়। এর সাহায্যে দ্রুত অবরোহণ বা এ্যাব্‌সেল করা যায়। আইস-এর বদলে এটি ব্যবহার করা নিরাপদ।

পিটন হ্যামার—পাথরের ফাটলে পিটন লাগাবার বিশেষ ধরণের হাতুড়ি। এর মাথা শক্ত স্টীলের এবং বাট মজবুত কাঠের তৈরি। হাতুড়ির মাথাটা বেশ বড় এবং থ্যাবড়া, কিন্তু অপর দিক সরু। মাথা দিয়ে পিটন লাগানো হয় এবং সরু দিকটা দিয়ে ছোট ছোট গাছ লতাপাতা এবং নোংরা পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করা হয়। হাতুড়ির বাটের ওপরে যেখানে মাথা লাগানো থাকে সেখানে একটা শক্ত ধাতুর পাত দিয়ে মোড়া থাকে, যাতে হাতুড়ির মাথা আলগা না হয়ে যায়। বাটের নিচে একটা গর্ত থাকে তাতে $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত নাইলন দড়ির ফাঁস লাগানো থাকে হাতে জুত করে ধরার জন্য। হাতুড়ি ব্যবহারের সময় হাত ফসকে গেলেও হাতুড়ি নিচে পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে না। অনেক লম্বা দড়িতে হাতুড়ি গলায় অথবা কোমরে ঝুলিয়ে নেয় কাজের সুবিধার জন্য।

আইস হ্যামার—প্রায় পিটন হ্যামারের মতোই, তবে এর মাথার বিপরীত দিকের পিক অনেকটা বড় এবং সরু। এই হাতুড়ি দিয়ে যেমন পিটন লাগানো এবং খোলার কাজ সহজেই করা যায়, তেমনই খুব শক্ত বরফে হাত দিয়ে ধরার মতো ফাটল তৈরি করা এবং পা রাখার ধাপ বানানো যায়। চিমনির অপরিসর দেওয়ালের শক্ত বরফ ও পাথরে হাত-পা রাখার জায়গা অতি সহজেই বানানো যায়। স্টেপ কাটিংও করা যায় আইস হ্যামার দিয়ে।

হ্যামার এ্যাক্স—আইস-এ্যাক্স ও আইস হ্যামারের সংমিশ্রণে তৈরি। এর মাথাটা আইস এ্যাক্সের শাভ্‌ল্ বদলে, বাকিটা আইস এ্যাক্সের মতোই। লম্বায় ১৮ থেকে ২২ ইঞ্চি এবং হাতলের নিচের অংশের কাঠ বেশ মোটা। এতে হ্যামার এ্যাক্স ধরার খুব সুবিধে। এটি ব্যবহার হয় যেখানে পাথর এবং বরফ মিলে মিশে থাকে। কখনো রক্ কখনো আইস পিটন লাগাবার জন্য এই হাতুড়ি ব্যবহার করা হয়। হ্যামার এ্যাক্স দিয়ে সুন্দর ভাবে বরফে হাত-পা রাখার জায়গা বানানো এবং স্টেপ কাটিং করা যায়।

আইস এ্যাক্স বা তুষার কুঠার নরম বরফে অথবা শক্ত বরফে আরোহণ-অবরোহণের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। তুষার কুঠার কঠিন বরফের পথে বাড়তি আর একটি পায়ের সাহায্য করে। অন্ধের যেমন লাঠিই ভরসা, পর্বতারোহীর আইস এ্যাক্সও তেমন প্রধান অবলম্বন। উচ্চতা অনুযায়ী এর গড়ন হয়। তবে সাধারণ আইস এ্যাক্সের উচ্চতা ২৭ থেকে ৩০ ইঞ্চির মধ্যে।

আইস এ্যাক্স স্টীল এবং কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। মাথাটা স্টীলের এবং হাতল শক্ত কাঠের। মাথার যে দিকটা সরু তার ইংরেজী নাম পিক্ (Pick) এবং চওড়া দিককে বলে শাভ্ল্ অথবা এজ (adze)। পিক্ দিয়ে শক্ত বরফে ধাপ কাটা হয় যাকে স্টেপ কাটিং বলে এবং এজ্ দিয়ে তুষার এবং গুঁড়ো বরফ কাটা ও পরিষ্কার করা হয়। হাতলকে বলে স্যাফ্ট (Shaft) এবং এটি শক্ত কাঠের দ্বারা তৈরি। ফেরুল এবং স্পাইক আইস এ্যাক্সের বিশেষ প্রয়োজনীয় দুটি অংশ। ফেরুল (ferrule) স্টীলের তৈরি এবং কাঠের হাতলের নিচের দিকে থাকে। এর সঙ্গে লোহার কাঁটা (spike) লাগানো থাকে। স্পাইক দিয়ে বরফের নিচে কোথায় ফাটল (crevasse) আছে তার হদিস করা হয়। আইস এ্যাক্সের মাথা অর্থাৎ পিক্ এবং এজ্ কাঠের হাতলের সঙ্গে দুটো স্টীলের পাতদ্বারা মোড়া থাকে। এ কারণে স্যাফ্ট থেকে হেড আলাদা হয়ে যেতে পারে না।

অয়ার এবং রোপ ল্যাডার—আর্টিফিসিয়াল রক্ ক্লাইমিং এবং কঠিন বরফের দেওয়ালে অয়ার আরোহণ জন্য ব্যবহৃত হয়। স্টীলের পাক দেওয়া (coiled) তারের তৈরি মইকে ওয়্যার ল্যাডার বলে। রোপ ল্যাডার তৈরি হয় দু'গাছা নাইলনের অয়েল্ড্ দড়ি দিয়ে। পা রাখার জন্য এ্যালুমিনিয়মের হালকা বার ব্যবহার করা হয় উভয় মইয়ে।

গ্লাভ্স-শৈলারোহণ ও পর্বতারোহণের জন্য বিভিন্ন ধরণের দস্তানা ব্যবহার করা হয়। দ্রুত অবরোহণের (এ্যাব্সেল) জন্য

দরকার একজোড়া চামড়ার দস্তানা। দস্তানার হাতের পাতায় মোটা অথচ নরম চামড়া থাকে, যাতে দড়ির ঘষা লাগায় হাতে ক্ষত সৃষ্টি না হয়। একে এ্যাবসেলিং (abseilling) গ্লাভ্‌স বলে।

পর্বতারোহণে চামড়ার গ্লাভ্‌সের বদলে বায়ু নিরোধক মিটেন বেশি কার্যকরী। এর বাইরের অংশ বায়ু নিরোধক কাপড় এবং ভেতরে থাকে পশমের লাইনিং। একে উইন্‌প্রুফ মিটেন বলে। এই মিটেন বরফে খুবই উপযোগী। তা ছাড়া, মোটা পশমের এবং পালকের তৈরি দস্তানা ব্যবহার করা হয়।

মোটামুটি পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জামের কথা বলা হল। সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করার আগে যেমন তার গুণাগুণ বিচার করে নিতে হয়, তেমনই ব্যবহারের সময় এবং পরে তার যত্ন নিতে হয়। না হলে সাজ-সরঞ্জাম সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

যে সাজ-সরঞ্জামের কথা আলোচনা করলাম তার অতি সামান্যই আমাদের দেশে তৈরি হয়। এখনো বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে আমাদের পর্বতারোহীদের। এর কারণও আছে। প্রয়োজনের তাগিদ থাকলেও ক্রয়ের ক্ষমতা না থাকায় তৈরি মাল বিকোয় না যথাযথ। ব্যবসায়ীরাও খুব একটা আগ্রহী হয় না নতুন নতুন মাল তৈরি করায়। ফলে দাম আকাশ ছোঁয়া।

কিন্তু দেশের ছেলেরা যদি দলে দলে পাহাড় পাহাড় খেলায় আগ্রহী হয় এবং এ-খেলা যদি বাংলার বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন বাড়বে। ব্যবসায়ীরা আগ্রহী হবে। প্রতিযোগিতা বাড়বে ওদের মধ্যে। সরঞ্জামের দামও কমবে। আর, সরকার যদি পর্বতারোহণের মতো শৈলারোহণ শিক্ষার জন্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন, তাহলে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের সাজ-সরঞ্জামের জন্য বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না আর।

সাজ-সরঞ্জাম

ক্লাইমিং বুট

আইস এ্যাক্স

রুক্‌স্যাক্

হ্যামার এ্যাক্স
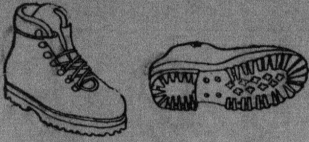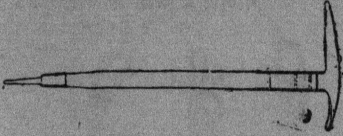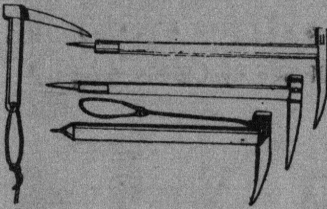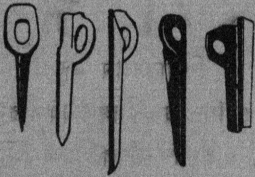
পিটন হ্যামার

রক্ পিটন ও আইস পিটন
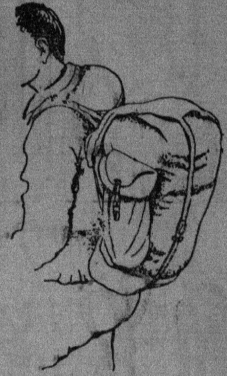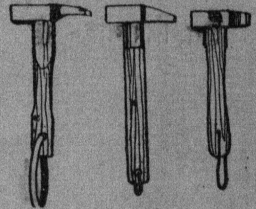
ওপরে—কেব্‌লড রোপ
নিচে—ক্যারন্‌ম্যান্‌টেল রোপ
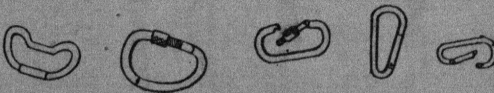
ক্যারাবিনার
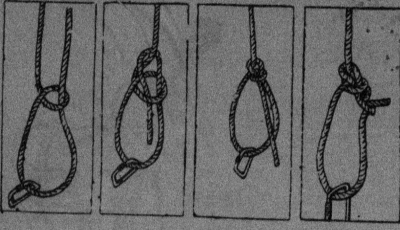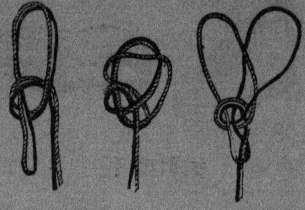
বোলাইন নট্‌

বোলাইন অন দি বাইট নট্‌
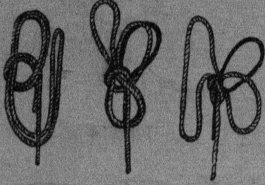
ট্রিপ্‌ল বোলাইন নট্‌
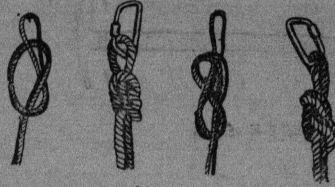
ওভারহ্যাণ্ড নট্‌ (প্রথম ও দ্বিতীয়)
ফিগার-অব-এইট নট্‌ (তৃতীয় ও চতুর্থ)
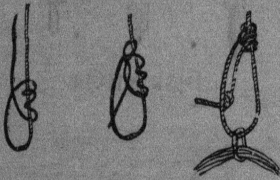
টারবাক নট্‌—কেব্‌লড রোপ
ব্যবহার করা উচিত
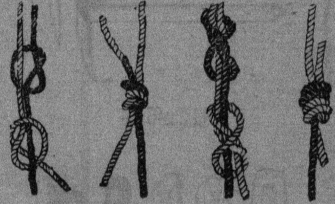
ফিসারম্যান নট্‌
প্রথম ও দ্বিতীয়—সিঙ্গল ফিসারম্যান
তৃতীয় ও চতুর্থ—ডবল ফিসারম্যান
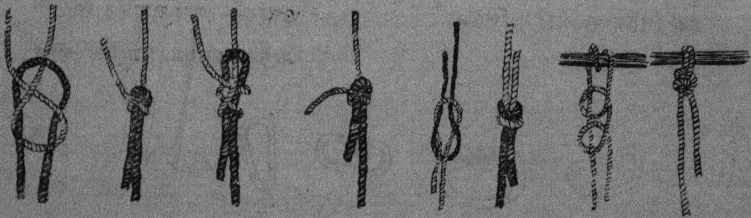
প্রথম ও দ্বিতীয়—সিঙ্গল সিটবেণ্ড নট্‌
তৃতীয় ও চতুর্থ—ডবল সিটবেণ্ড নট্‌

রিফ্‌ নট্‌

॥ চার ॥

রোপ নট্‌স্ (Rope Knots)

শৈলারোহণ এবং পর্বতারোহণে যে দড়ি ব্যবহার করা হয় তা যথা-যথরূপে কাজে লাগাবার জন্য গিঁট অর্থাৎ নট্‌স্ (knots) বাঁধতে হয়। আরোহীদের কোমরে পরস্পর যে দড়ি বাঁধা হয় তার গিঁটকে বলে 'এণ্ড-ম্যান নট্' (End-man Knot)। এণ্ড-ম্যান নট্ একটি মাত্র বিশেষ কোনো গিঁট নয়। কয়েকটি গিঁটকেই এণ্ড-ম্যান নট্ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পাহাড়ের বহিরঙ্গে বেরিয়ে থাকা মজবুত পাথরের খোঁচে বিলে করার জন্য যে নট্ ব্যবহার করা হয় তাকে স্পাইক বিলে নট্‌স্ (Spike Belay Knots) বলে। কয়েকটি গিঁট আছে যা দিয়ে স্পাইকের সঙ্গে দড়ি অথবা স্লিং দিয়ে নট্ লাগানো যায়। বিভিন্ন গিঁটের বিভিন্ন তাদের নাম এবং নানা ধরণের কার্যকারিতা আছে।

রোপ নট্‌স্ সম্বন্ধে ইংরাজীতে অনেক বই আছে। স্কাউটিং-এর জন্য অনেক নট্‌স্ ব্যবহার করা হয়, যা শৈলারোহণ অথবা পর্বতারোহণে প্রয়োজন হয় না। বিশেষ কয়েকটি রোপ নট্‌স্ জানা থাকলেই শৈলারোহীর কাজ চলে যায়।

রোপ নট্‌স্ অর্থাৎ দড়ির গিঁট।

শৈলারোহণে দড়ি যেমন বিশেষ প্রয়োজনীয় তাতে গিঁট লাগানো ততোধিক প্রয়োজনীয়। দড়িতে ঠিক মতো গিঁট না লাগাতে পারলে শৈলারোহণে বিপর্যয় অনিবার্য। ভুল গিঁট লাগাবার ফলে দড়ি খুলে গিয়ে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। তাই শৈলারোহণ শিক্ষার আগে দড়ির গিঁট—রোপ নট্‌স্, মোটামুটি শিখে নিতে হয়। শেখার পর নিয়মিত নট্‌স্ বানাবার অভ্যাস করা উচিত, না হলে সহজেই ভুল হতে পারে।

প্রতিটি শৈলারোহী এবং শিক্ষার্থীর খেয়াল রাখতে হবে, যে গিঁট তারা বানাচ্ছে তা যেন নির্ভুল হয়। গিঁট যাতে সহজে আলগা না হয়ে যায় এবং দড়ির যে প্রান্তে গিঁট দেওয়া হচ্ছে সে প্রান্তের কিছুটা দড়ি যেন বাড়তি থাকে। দড়িতে গিঁট লাগাবার পর কোনো কারণে যদি গিঁট আলগা হয়ে যায়, তাহলে বাড়তি দড়ি থাকার জন্য গিঁট সম্পূর্ণ খুলে যাওয়ার আশংকা থাকবে না। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি গিঁট দেওয়ার পর বাড়তি দড়িটা দিয়ে একটা বা দুটো সাধারণ গিঁট লাগিয়ে নেওয়া হয়। এতে গিঁট খোলার আর কোনো আশংকাই থাকে না। বিশেষ করে ক্যারন্ম্যান্টেল রোপের গিঁট খুবই নরম এবং সহজেই খুলে যেতে পারে। আরোহণের সময় বারবার গিঁট পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন।

শৈলারোহণের জন্য নিয়মিত ব্যবহার করা হয় এমন কিছু দড়ির গিঁট নিয়ে আলোচনা করব।

বোলাইন (bowline) এবং টারবাক (tarbuck) নট্ খুবই উপযোগী। বিলে করার দড়ি আরোহীর কোমরে বোলাইন অথবা টারবাক নট্ দিয়ে বেঁধে নেওয়া হয়। অবশ্য বোলাইন এবং টারবাক নট্ লাগাতে একটু বেশি সময় লাগে। ক্যারন্ম্যান্টেল রোপে এই গিঁট তেমন ভরসা করা যায় না। গিঁট খুলে আসার আশংকা থাকে। বোলাইন এবং টারবাক নট্ 'এণ্ড-ম্যান নট্' নামে পরিচিত।

যারা কোমরে ওয়েষ্ট ব্যাণ্ড ব্যবহার করে তারা বিলের দড়ি ওয়েষ্ট ব্যাঙ্কে সোজাসুজি বাঁধার পরিবর্তে একটা ক্যারাবিনারের সাহায্যে বিলের দড়িতে টারবাক নট্ লাগিয়ে ওয়েষ্ট ব্যাণ্ডেল ক্লিপ করে নেয়। এ ক্ষেত্রে বিলের দড়ি কেবল্ড হওয়া চাই। ক্যারন্ম্যান্টেল রোপ ব্যবহার করলে টারবাকের বদলে 'ফিগার-অব-এইট' নট্ লাগানো নিরাপদ।

ফিগার-অব-এইট (figure-of-eight) নট্ ইংরাজী আট

সংখ্যার মতো দেখতে। বর্তমানে এই নট্ খুবই ব্যবহৃত হয়। টারবাক অথবা বোলাইনের চেয়েও এই নট্ কার্যকরী। ক্লাইমিং রোপ, বিলে রোপ অথবা এ্যাঙ্‌কারে এই নট্ লাগানো চলে। বিশেষ করে ফ্রেড নিলে করার জন্য ফিগার-অব-এইট নট্ খুবই প্রযোজ্য।

ফিগার-অব-এইট্ নটের বিশেষ গুণ এই নট্ ক্যারন্‌ম্যান্‌টেল রোপে আলগা হয়ে যায় না ; দড়িতে ভার বহনের সময় খুলে যাবার ভয় থাকে না ; বিলের 'মিডল ম্যান নট্' হিসাবে ওভারহ্যাণ্ড নটের পরিবর্তে এই নট্ লাগানো চলে ; এ্যাঙ্‌কার নট্ হিসাবে ওয়েষ্ট ব্যাণ্ডে বিলে রোপ লাগানো যায়।

বোলাইন অন দি নাইট (bowline on the night) নটে অতিরিক্ত লুপ (loop) থাকে যা থাই-লুপ অথবা চেস্ট লুপ হিসাবে ব্যবহার করা চলে। এতে হঠাৎ পতনজনিত আঘাত থাই অথবা বুকের লুপে ছড়িয়ে পড়ে বলে আরোহীর ক্ষতি কম হয়। না হলে সমস্ত আঘাত কোমরের ওপর পড়ে কোমর ভেঙ্গে যেতে পারে।

এই নট্ "ক্রিভাস রেসকিউ"-এর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রিভাসের গহ্বর থেকে উদ্ধার কার্য চালাবার জন্য যে আরোহীকে ক্রিভাসের মধ্যে নামতে হয় তার ব্যবহারের জন্য এবং ক্রিভাসযুক্ত হিমবাহ অতিক্রম করার সময় এই নট্ ব্যবহার করা হয়। আর্টিফিসিয়াল ক্লাইমিং করার জন্য এই নট্ খুবই উপযোগী।

ট্রিপ্‌ল্ বোলাইন (Triple bowline)—নট্ আরো ভালো গিঁট। এতে তিনটি লুপ থাকে এবং গিঁট দেওয়া খুব সহজ। অতিরিক্ত লুপ থাকায় স্বাচ্ছন্দ্যও বেশি।

ওভারহ্যাণ্ড নট্ (Overhand knot)—মিডলম্যানের কোমরে বিলে রোপ লাগাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। বিলে করার জন্য যখন ক্লাইমিং রোপের পরিবর্তে প্রধান বিলে রোপ ব্যবহার করা হয় তখন সেই বিলে রোপ স্পাইকের মধ্য দিয়ে কোমরে ওয়েষ্ট লাইনের সঙ্গে ওভারহ্যাণ্ড নট্ লাগিয়ে দুটো সাধারণ গিঁট থাম নট্ দিয়ে

নিতে হয়। ওয়েষ্ট ব্যাণ্ডে ক্যারাবিনারের সাহায্যে বিলে রোপ লাগাতে ওভারহ্যাণ্ড নট্ ব্যবহৃত হয়। এখানেও সাধারণ গিঁট অর্থাৎ থাম (Thumb) নট্ লাগাতে হয়। যে কোনো গিঁটকে মজবুত করার জন্য গিঁট লাগাবার পর ওভারহ্যাণ্ড নট্ ব্যবহার করা হয়।

ফিসারম্যান্ নট্ (Fisherman knot)—একই পরিধির দুটি দড়ি জোড়া লাগাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। আরোহণ অবরোহণের সময় একটা দড়িতে কাজ না হলে তখন অতিরিক্ত দড়ি ব্যবহার করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ফিসারম্যান্ নট্ লাগিয়ে দুটি দড়ি জোড়া লাগান হয়। বিশেষ করে যেখানে দড়ির গিঁট আলগা হবার আশংকা থাকে, সেখানে ডবল ফিসারম্যান্ নট্ ব্যবহার করতে হয়।

বিশেষ প্রয়োজনে স্লিংয়ের দু'মুখ অথবা দু'গাছি দড়ি জোড়া লাগাবার জন্য ফিসারম্যান্ নট্ উপযোগী। ওয়েষ্ট ব্যাণ্ড-এর দু'মুখ এই নট্ লাগিয়ে জোড়া যায়।

সিট্‌বেণ্ড (Sheetbend)—আর এক প্রকারের গিঁট। ভিন্ন পরিধির দুটি স্লিং অথবা এ্যাব্‌সেল স্লিং কিংবা বিলে রোপ জোড়া-লাগার জন্য বিশেষ উপযোগী। অনেকাংশে সিট্‌বেণ্ড ফিসারম্যান্ নটের চেয়েও ভালো। যথাযথ স্থানে দ্রুত গিঁট সরিয়ে নেওয়া যায় এই নটে, যেটা ফিসারম্যানে সময় সাপেক্ষ। সিঙ্গল সিট্‌বেণ্ডের চেয়ে ডবল সিট্‌বেণ্ড অধিক বিশ্বস্ত।

রিফ্ নট্ (Reef knot)—অতি সাধারণ গিঁট। এর ব্যবহার খুবই সীমিত। দড়ি যদি জমির ওপর থাকে তবেই এই গিঁট ব্যবহার করা চলে। দড়ির ভাসমান অবস্থায় এ গিঁট বিপজ্জনক তাই ব্যবহার করা উচিত নয়। এ গিঁট সাধারণত ফাষ্ট এড্-এর ব্যাণ্ডেজ করার জন্য উপযোগী। এ ছাড়া ওয়েষ্ট ব্যাণ্ডে এণ্ডম্যান এবং মিডল ম্যান নট্ হিসাবে রিফ্ নট্ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্লোভ হিচ্ (Clove hitch)—নট্ খুবই সাধারণ গিঁট। যে ফাটলের মধ্যে পিটনের ব্লেড সম্পূর্ণ প্রবেশ করে না সেখানে পিটনের

চোখের মধ্য দিয়ে দড়ি না এনে রক্ ফেসের গায়ে পিটনের ব্লেডে নট্ লাগাতে হয়। এই নট্ই 'ক্লোভ হিচ্'। ফাটলের মুখে পিটনে দড়ি বাঁধলে পিটন খুলে আসার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রুসিক নট্ (Prusik knot)—ক্লাইমিং রোপের ওপর স্লিং দিয়ে এই গিঁট বানাতে হয়। ইচ্ছামতো এই নট্ দড়ির ওপর সরিয়ে স্থান পরিবর্তন করানো যায়। নটের ওপর ওজন পরলেই দড়িতে শক্ত হয়ে নট্ আটকে যায়। ক্রিভাস থেকে উদ্ধার করার জন্য এই নট্ খুবই উপযোগী।

বিশেষ করে, ক্রিভাসের মধ্যে উদ্ধারের জন্য এবং ক্রিভাসের বাইরে উদ্ধারে সাহায্য করা উভয় কাজেই প্রুসিক নট্ উপযোগী। ওভার হ্যাং রক্ আরোহণের জন্যও প্রুসিক নট্ ব্যবহার করতে হয়।

আলোচ্য নট্গুলি মোটামুটি শৈলারোহণে ব্যবহার করা হয়। নিয়মিত এই নট্গুলি অভ্যাস করলে ভুল হবার আশংকা থাকে না। ভুল নট্ শৈলারোহীর শত্রু।

আরোহণ অবরোহণের সময় দড়ির নট্ বারবার পরীক্ষা করে নিতে হয়। গিঁট আলগা হওয়াই তার ধর্ম। আলগা গিঁট আবার বিপজ্জনক। তাই বিপদের বিরুদ্ধে পর্বতারোহীকে সব সময় সজাগ থাকতে হবে। প্রতিবার আরোহণের সময় যত শক্ত এবং ভালো গিঁটই হোক না কেন পরীক্ষা করে দেখে, তবে ব্যবহার করা উচিত। এই অভ্যাস দুর্ঘটনার কবল থেকে আরোহীকে রক্ষা করবে।

॥ পাঁচ ॥

শৈলারোহণের প্রথম কথা আত্মবিশ্বাস আর সাহস। এ দুটি গুণ না থাকলে ভালো শৈলারোহী হওয়া যায় না। প্রথম-পাঠে সবায়েরই আত্মবিশ্বাস বা সাহস নাও থাকতে পারে। কিন্তু শৈলারোহণের সব কলাকৌশল অভ্যাস করতে করতে যখন ভালোভাবে রপ্ত হয়ে যাবে, তখন আত্মবিশ্বাস এবং সাহস আপনি বাড়তে থাকবে।

এই দুটি গুণ কারো সহজাত, কারো সহজাত নয়। কিন্তু অভ্যাস করতে করতে গুণ দুটি অনেকের মধ্যেই বিকশিত হয়।

আত্মবিশ্বাস আর সাহস বাড়াবার জন্য শৈলারোহীকে প্রথম প্রথম সহজ রক্ ফেসে ওঠা-নামা করে কৌশল শিখে নিতে হয়। সহজ পাহাড়ে সাহস বাড়লে কঠিন পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে কঠিন থেকে কঠিনতর রক্ ফেসে ওঠা-নামার কৌশল রপ্ত করতে পারলে সাহস এবং আত্ম-বিশ্বাস আপনি বেড়ে যাবে।

শৈলারোহণে যার আত্মবিশ্বাস আর সাহস আছে, পর্বতারোহণে তার সাফল্য অনিবার্য। পর্বতারোহণ করার আগে নিয়মিত ভাবে শৈলারোহণ করে সাহস করে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়া উচিত প্রতিটি পর্বতারোহীর।

বিদেশী পর্বতারোহীরা হিমালয়ে অভিযানে আসার আগে নিজেদের দেশের কঠিন শিলায় আরোহণ করে তৈরি হয়ে নেয়। তাই যে কোনো কঠিন পথেই তারা শীর্ষে ওঠার সাহস রাখে আর এই সাহসই তাদের সাফল্যের স্বর্ণশিখরে নিয়ে যায়।

কলকাতা এবং মফস্বলের বিভিন্ন পর্বতারোহী সংস্থা ছাত্র-

ছাত্রীদের শৈলারোহণ শিক্ষার আয়োজন করেন শুশুনিয়া এবং জয়-চণ্ডী পাহাড়ে। শিক্ষা শিবির শীতকালেই পরিচালিত হয়।

এ প্রসংগে কলকাতার মাউণ্টেনীয়ারস ক্লাব আয়োজিত বার্ষিক শৈলারোহণ শিক্ষা শিবিরে ছাত্র ছাত্রীদের শৈলারোহণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব।

পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলের বিরাট এক বাংলোয় ওই বার্ষিক শিক্ষা শিবির হয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশ। দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনষ্টিটিউট দু'জন শেরপা ইনস্ট্রাকটর পাঠিয়েছেন। ক্লাবের কয়েকজন অভিজ্ঞ পর্বতারোহীর শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়েছেন। আমার ওপর ছিল শিবির এবং শিক্ষাক্রম পরিচালনার দায়িত্ব।

শিক্ষাক্রম মোট পাঁচ দিনের। প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের আলাপ পরিচয়। বক্তৃতার মাধ্যমে শৈলারোহণ ও পর্বতারোহণের উপযোগিতা, শিবির স্থাপন (camping), সাজ-সরঞ্জাম (equipment) পরিচয় এবং তার ব্যবহার পদ্ধতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, পাহাড়ে পথচলার (trekking) নিয়ম কানুন, পাহাড়-পর্বতের নিয়মানুবর্তিতা (mountain manners), প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid) এবং উদ্ধার পদ্ধতি (rescue operation) ইত্যাদি। পরবর্তী চারদিন হাতে কলমে শৈলারোহণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

শিক্ষার্থীদের সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সকাল সাড়ে চারটেয় উঠে আধ ঘণ্টার দৌড়ঝাঁপ আর শরীর চর্চা। ছ'টার সময় শুশুনিয়া পাহাড়ের মাথায় যেতে হয় রোজ। সেখানে পাহাড় চেনা—অর্থাৎ পাহাড়ের কোন অংশের কি নাম। শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় কাকে রক্ ফেস বলে, কাকে বলে চিমনী। কোনটা স্পার (spur) আর কোনটা রিজ (Ridge)। তারপর

শেখানো হয় কি করে খালি হাত-পায়ে কঠিন শিলাখণ্ড বেয়ে উঠতে হয়। যার সাহায্যে শিলাখণ্ড আরোহণ করতে হবে তাদের নাম কি।

শুশুনিয়া পাহাড়ের শীর্ষে নানা আকারের শিলাখণ্ড আছে। তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কয়েকটি নার্সারী রক্ও আছে। এ ছাড়াও কয়েকটি মাঝারী এবং কয়েকটা বেশ কঠিন শিলাখণ্ডও রয়েছে।

নতুন শিক্ষার্থীদের নার্সারী রকে নিয়ে যাওয়া হয় আগে। সেখানে শিক্ষক শিলাখণ্ডের বিবরণ দেন। তারপর শিলায় খালি হাতপায়ে কি ভাবে আরোহণ অবরোহণ করতে হয় তাও বুঝিয়ে এবং দেখিয়ে দেন। একে বলে ফ্রি হ্যাণ্ড ক্লাইমিং।

শিলাখণ্ডে নানা আকারের ফাটল থাকে। কোনোটা আড়াআড়ি কোনোটা লম্বালম্বি ফাটল। এ সব ফাটলে হাত এবং পা রেখে শিলাখণ্ডে আরোহণ করা হয়। ফাটল (crack) রক্ ফেস আরোহণে সাহায্য করে বলে একে শৈলারোহণের পরিভাষায় বলে হোল্ডস্ (holds)। হোল্ডস্ সাধারণত তিন রকম—ইন্‌কাট (incut), ফ্ল্যাট (flat) এবং রাউণ্ডেড (rounded)।

ইন্‌কাট—যে ফাটল শিলার ভেতরে, ওপরে অথবা নিচে বেঁকে গেছে তাকে ইন্‌কাট হোল্ডস্ বলে। এই ফাটল হাতের আঙ্গুল দিয়ে সবচেয়ে ভালোভাবে ধরা যায়। এমন কি দু'হাতের ওপর সমস্ত শরীরের ভারও বহন করা যায়।

ফ্ল্যাট এবং রাউণ্ডেড হোল্ডস্—সোজা ভেতরে চলে যাওয়া ফাটলকে ফ্ল্যাট বলে এবং ইন্‌কাটের মতো এর কোনো খাঁজ থাকে না। রাউণ্ডেড ফাটলের মুখের শিলা গড়ানো আকারের। ফ্ল্যাট হোল্ডস্ ধরে মাঝারি ধরনের আরোহণ করা যায়, কিন্তু রাউণ্ডেড হোল্ডস্ তেমন কোনো বিশেষ সাহায্য করে না। তবে এতে পা রাখার খুব সুবিধে। এই দু'প্রকারের ফাটল ব্যবহার করতে হলে ভালো ব্যালান্স থাকা দরকার। রাউণ্ডেড হোল্ডস্‌কে প্রেসার হোল্ডস্ হিসাবে

ব্যবহার করা চলে। হাতের তালুর চাপ দিয়ে আরোহণ বা অবরোহণ করতে হয় অনেক সময়। এইভাবে হাতের তালুর চাপকে প্রেসার হোল্ডস্ বলে। গড়ানে ফাটলে প্রেসার হোল্ডস্ ব্যবহার সবচেয়ে নিরাপদ।

ওপরের তিনপ্রকারের ফাটল ছাড়াও আরো নানা ধরণের ও আকারের ফাটল থাকে শিলাখণ্ডে। এর প্রতিটির সদ্ব্যবহার করে শৈলারোহীরা। আরোহণ অবরোহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি সুযোগ শৈলারোহীদের নিতে হয়। অন্যান্য ফাটলগুলি হল—সাইড হোল্ডস্, আণ্ডার হোল্ডস্, গ্রিপ হোল্ডস্ এবং ম্যাণ্টেলসেল্ফ।

শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদের নার্সারী রকের হোল্ডস্ চিনিয়ে দেবার পর আরোহণের কৌশল দেখানো হল। ইনস্ট্রাকটর শিলাখণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে দেখলেন কোন পথে আরোহণ করবেন। প্রতিটি আরোহী সব সময় নিজের খুশিমত পথ বাছাই করে নেন। যে পথে ভাল হোল্ডস্ আছে সে পথই নিরাপদ।

ইনস্ট্রাকটর নিজের মনের মতো পথ খুঁজে নিয়ে ওঠা শুরু করেন। কাঁধের সমান্তরাল রেখায় দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে ফাটল ধরে পা রাখার জায়গা দেখে নিয়ে এক পায়ে উঠে দাঁড়ান। ইতিমধ্যে আরো ওপরের ফাটল দেখে নিয়ে এক হাত বাড়িয়ে সেটা ধরেন। হাত এবং পায়ের পরস্পর পরিবর্তনে ছবির মতো উঠে যান ওপরে। লক্ষ্য করার মতো যে উনি আরোহণের সময় দু'হাত এবং এক পা অথবা দু'পা এবং এক হাতের ব্যবহার করছেন। এক সঙ্গে চার হাত পায়ে উঠছেন না। একেই বলে 'থ্রি-পয়েন্ট ক্লাইমিং (three point climbing)। তা ছাড়া ওঁর শরীর শিলাখণ্ড থেকে বেশ তফাতে রয়েছে। কখনোই মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেহের কোনো অংশই শিলা স্পর্শ করছে না। আর এর ফলে ওঁর দেহের ভারসাম্য (balance) রয়েছে চমৎকার।

ইনস্ট্রাকটর যখন শিলাখণ্ডের ওপরে উঠে গেলেন তখন শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বাড়ল।

ছেলে-মেয়েরা নার্শারী রকের বিভিন্ন ফেস দিয়ে আরোহণ অবরোহণ করা শুরু করল। কেউ কেউ প্রথম প্রচেষ্টায় তরতর করে উঠে গেল শিলাখণ্ডের মাথায়, কেউ বা আরোহণ করতে গিয়ে আছাড় খেল। আছাড় খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মনে সাহস এনে আবার আরোহণ করল। পাহাড় পাহাড় খেলায় ওরা মেতে উঠল।

শিক্ষার্থীরা নার্সারী রকে অনুশীলন করার পর তাদের মাঝারী রকে নিয়ে আসা হল।

আগেই বলেছি, বিভিন্ন শিলাখণ্ডের (rock face) বিভিন্ন প্রকৃতি এবং আকার আছে। পর্বতারোহণের পরিভাষায় তাদের বিভিন্ন নামও দেওয়া আছে। রক্ ফেসগুলির নাম হল, গ্লেসিস (glacis), স্ল্যাব (slab), ওয়াল (wall) এবং ওভারহ্যাং (over-hang)।

যে রক্ ফেস ৩০ ডিগ্রি কোণাকুণি তাকে বলে গ্লেসিস। এই শিলায় আরোহণ অবরোহণ সহজ। বিশেষ কোনো নৈপুণ্যের দরকার হয় না। তবে সাবধানে আরোহণ করা উচিত, কারণ হাত-পা পিছলে গেলে তখন সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ে।

স্ল্যাব ৩০—৬০ ডিগ্রি খাড়া হয়। ছোট বড় নানা আকারের হোল্ডস্ থাকে স্ল্যাবে। পা রাখার ভাল জায়গা পাওয়া যায় বলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুশীলনের জন্য আদর্শ। কিছু স্ল্যাবে আরোহণ-অবরোহণ যেমন সহজ, তেমন কঠিন স্ল্যাবও আছে যা আরোহণ অথবা অবরোহণ খুবই কষ্টসাধ্য এবং অসুবিধাজনক। অবশ্য স্ল্যাবে পা রাখার ভাল জায়গা থাকে যাতে আরোহী বিশ্রাম নিতে পারে পর্যাপ্ত। স্ল্যাবে পিছলে পড়ার আশংকা খুবই বেশি থাকে তাই সাবধান হওয়া উচিত।

ওয়াল অর্থাৎ দেওয়াল। সাধারণত ৬০—৯০ ডিগ্রি কোণাকুণি খাড়া প্রাচীর। ৭০-৭৫ ডিগ্রি খাড়া শিলাখণ্ডকে দেওয়ালের মতোই কঠিন মনে হয়। আরোহণ করাও খুবই শ্রমসাধ্য এবং হাতের জোর

থাকা দরকার। কারণ অধিকাংশ সময় হাতের ওপর দেহের বেশির ভাগ ভারই বহন করতে হয়। শৈলপ্রাচীর আরোহণের জন্য ভাল হোল্ডস্ দরকার। প্রাচীর যত বেশি খাড়াই হবে আরোহণ ততো কঠিন হয়ে পড়বে। অল্পেই দেহের শক্তি শেষ হয়ে গেলে আরোহীর বিপদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। তাই কঠিন অংশ আরোহণের আগে প্রাচীরের সঠিক পথ খুঁজে নিয়ে ছন্দবদ্ধ দ্রুততায় আরোহণ শেষ করতে হবে। এর জন্য চাই প্রচণ্ড মানসিক স্থৈর্য এবং দৃঢ় সংকল্প।

ওভারহ্যাং—ঝুলন্ত পাথর সাধারণত ৯০ ডিগ্রির ওপরে হয়। সহজ শিলাখণ্ডের ওভারহ্যাং অধিকাংশ ছোট হয় এবং বহু ফাটল থাকে। খুব বড় ওভারহ্যাংগুলিতে প্রায়ই লম্বা চওড়া-ফাটল থাকে। যে-কোনো ওভারহ্যাং অতিক্রম করার সময় সঠিক পথ ঠিক করে নিতে হয়। অনেক সময় ওভারহ্যাংয়ের পাশে পাথরের কোণ (angle) থাকে। সেই কোণের দু'দিকে দু'পায়ে ব্রিজ (bridge) করে কঠিন ওভারহ্যাং পার হওয়া যায়। ওভারহ্যাংয়ে পা রাখার ভাল জায়গা থাকার দরুন শরীরের অধিকাংশ ভার পায়ের ওপর রাখা যায়। কঠিন ওভারহ্যাং অতিক্রম করার জন্য আরোহীর মানসিক স্থৈর্য ও দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই।

মাঝারী আকারের রক্ ফেসের মধ্যে একটি স্ল্যাবের সামনে শিক্ষার্থীদের আনা হল। স্ল্যাবটি কোণাকুণি ৪৫—৫০ ডিগ্রি খাড়া। উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট। স্ল্যাবে নানা আকারের ফাটল এবং হোল্ডস্ আছে। বিশ্রাম নেবার ভাল জায়গাও আছে ওখানে।

ইনস্ট্রাকটর দেখিয়ে দিলেন কি ভাবে উঠতে হয়, কিভাবে নামতে হয়। কোন ফাটলে আঙুল আর পায়ের পাতা কিভাবে রাখতে হয়। শরীর পাহাড় থেকে কতটা ওপরে থাকবে। কিভাবে শরীরের ভারসাম্য রাখতে হবে, ইত্যাদি।

খাড়া দেওয়ালের মতো কঠিন মসৃণ বিরাট শিলাখণ্ড দেখে ভয় পেয়ে যায় শিক্ষার্থীরা। বিন্‌বিন্ করে ডিসেম্বরের শীতেও ঘামছে ওরা। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে শিলাখণ্ড বা স্ল্যাবটির দিকে। ভাবছে, এর গা বেয়ে টিকটিকি উঠতে পারে, মানুষ কদাপি নয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাসন্তী খুবই ডানপিটে, চটপটে এবং সাহসী। সব ব্যাপারে ওর আগ্রহ সবার আগে প্রকাশ পায়। নার্সারী রক্‌ ও সবার আগে বেশ সুন্দর ভাবেই আরোহণ করে। যে কোনো কাজ একবার দেখিয়ে দিলে ও তা চট করে বুঝতে পারে এবং সে কাজটি করার জন্য সবার আগে এগিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রেও বাসন্তী এগিয়ে এলো সবার আগে।

বাসন্তীর মনে হয়েছিল নার্সারী রকের মতো স্ল্যাব আরোহণও বুঝি সহজ। তাই সবার আগে স্ল্যাব আরোহণের আগ্রহ প্রকাশ করে ফেলল। শিক্ষকও ওকে ডাকলেন রক্‌ ফেসে ওঠার জন্য।

বাসন্তী রক্‌ ফেসের সামনে দাঁড়িয়ে আরোহণের পথ ঠিক করে নিল। একটু কঠিন দিকই বেছে নিল। স্ল্যাবটিতে চমৎকার ছোট ছোট হোল্ডস্ (ধরার জায়গা) আছে। কাঁধের সমান্তরাল দুটো ইনকাট্ হোল্ডস্ দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে ধরে ডান পায়ের পাতার অগ্রভাগ মসৃণ দেওয়ালে রেখে হাতের ওপর দেহের বেশির ভাগ ভার দিয়ে দাঁড়াল। এক ফিট ওপরে বাঁ পা রাখার মতো ভাল জায়গা দেখে, বাঁ পায়ের অগ্রভাগ রাখল সেখানে। তারপর আর একটু ওপরে ডান হাত দিয়ে গ্রিপ হোল্ড করার মতো একটা শক্ত পাথর খণ্ড পেল। সেটা ধরে আর এক ফিট ওপরে ডান পা তুলে নিল। ভাল হোল্ডস্ এবং পা রাখার (foot holds) সুন্দর জায়গা বাছাই করায় দেহের ভারসাম্য চমৎকার এবং সারাদেহ স্ল্যাবের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে রয়েছে।

বাসন্তী শুরুতে সুন্দর ভাবে বেশ খানিকটা ওপরে উঠে গেল। এখান থেকে রক্‌ ফেস প্রায় দশ ফুট খাড়া উঠে গেছে। ও আর

উঠতে পারছে না। স্ল্যাবের এই অংশটি প্রায় প্রাচীরের মতো। হোল্ডস্ খুবই সামান্য। ইনকাট্ নেই প্রায়। বেশির ভাগ সূক্ষ্ম ফ্লাট হোল্ডস্। পা রাখার জায়গা নেই। খুবই মসৃণ অংশ। বাসন্তী চেষ্টা করল ফাটলে হাতের আঙুল দিয়ে ধরে উঠতে, কিন্তু দু' তিনবার ব্যর্থ হয়ে শেষে তাকাল ওপরে আর নিচের দিকে। ব্যস, মুখ শুকিয়ে গেল, ঘামতে শুরু করল। ও তখন ভাবছে, এখান থেকে ওপরেও যেতে পারব না, নিচেও নামতে পারব না। যদি পড়ে যাই তো হাত-পা-ভাঙবে। সাহসী মেয়েটা মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। বাসন্তী দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। হাত-পা কাঁপছে ঠক ঠক করে। সারা দেহ রক্ ফেসে লেপটে আছে। এ অবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখা অসম্ভব।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ইনস্ট্রাকটর ওর পাশে গিয়ে সাহস দিলেন। কিছুটা নেমে ভাল একটা জায়গায় দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। তারপর বললেন, পথ কঠিন মনে হলে অথবা বাধা থাকলে নিচের নিরাপদ জায়গায় নেমে আসা উচিত। বিশ্রাম নেবার পর সঠিক পথ বার করে আরোহণ করবে। মনে বিশ্বাস আর সাহস সঞ্চয় না হলে কঠিন পথে আরোহণের চেষ্টা করা উচিত নয়।

বাসন্তীর ভয় কেটে গেল। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ও কঠিন শিলাখণ্ডটিকে পর্যবেক্ষণ করল। হ্যাণ্ড ও ফুট হোল্ডস্ ঠিক ঠিক দেখে নিয়ে আরোহণ শুরু করল। ওর মনে এখন আত্মবিশ্বাস ভরপুর।

আস্তে আস্তে ফাটল ধরে ওপরে উঠতে লাগল। ও ভাবছিল যে ইনস্ট্রাকটর আগের মতো ওর পিছনেই আছেন। পড়ে গেলে উনি সাহায্য করবেন। মনের সাহস বাড়ল আরও কিছুটা। শিলাখণ্ডের মাথায় উঠেই আনন্দে হাততালি দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে ইনস্ট্রাকটর নিচে বসে হাসছেন। আসলে উনি ওকে সাহস দিয়েই নেমে গেছেন।

বাসন্তীর আত্মবিশ্বাস বাড়ল এতে। এবং শিক্ষাক্রমে ওর কাজকর্ম সবচেয়ে ভাল হয়েছিল।

॥ ছয় ॥

অবরোহণ—শিলাখণ্ডে আরোহণের যেমন নিয়ম কানুন আছে, তেমন অবরোহণেরও কিছু রীতি আছে। সেগুলি হল, রক্ ফেসের বিপরীত দিকে মুখ রেখে নামা, পাশ ফিরে নামা এবং রক্ ফেসের দিকে মুখ রেখে নামা। এ ছাড়াও দড়ির সাহায্যে এ্যাবসেল (দ্রুত অবরোহণ) করে নামা যায়।

সহজ শিলাখণ্ডে তাড়াতাড়ি নামার জন্য রক্ ফেসকে পিছনে রেখে দু'হাতের ওপর দেহের বেশিরভাগ ভার দিয়ে সহজে নামা যায়। বাইরের দিকে মুখ রেখে অবরোহণের সময় হাত দুটো অনেকটা নামবে, কোমর ভাঁজ হবে, হাঁটুও প্রয়োজন মতো ভাঁজ করে সামান্য তফাতে পা দুটিকে রাখতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় খুব ভাল ভাবে নামার পথ পর্যবেক্ষণ করা যায়।

যে শিলায় বাইরের দিকে মুখ রেখে নামা অসুবিধাজনক অর্থাৎ শিলাখণ্ডের কোণাকুণি খাড়াই বেশি সেখানে পাশ ফিরে অবরোহণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে শিলাখণ্ড থেকে দেহের দূরত্ব বেশ কিছুটা তফাতে থাকবে যাতে নিচের হোল্ডস্ এবং পথ সহজে দেখা যায়।

যে রক্ ফেসে পাশ দিয়ে নামার অসুবিধা সেখানে রক্ ফেসের দিকে মুখ করে নামতে হয়। দেওয়ালের মতো খাড়াই শিলাখণ্ডে এভাবেই নামার নিয়ম। দু'হাত এবং দু'পা দেড়-দু'ফুট তফাতে থাকবে। তাতে দেহের ভারসাম্য এবং হাত-পা রাখার জায়গা খুঁজে নেওয়া যাবে সহজে।

সাধারণত খুব খাড়াই রক্ ফেস যে দু'গাছি দড়ির সাহায্যে দ্রুত অবরোহণ (abseiling) করা হয়। একে র‍্যাপেলিং কিংবা এ্যাবসেলিং বলে। র‍্যাপেলিংএ দেহের শক্তির অপচয় হয়না অথচ আরামের এবং অল্পসময়ের মধ্যে নিরাপদে নামা নিচে যায়।

কঠিন পথ আরোহণের পর নেমে আসার সময় অনেকেই তাড়াহুড়ো করে, অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এর ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। আরোহণের সময় যেমন, অবরোহণের সময় তার চেয়েও বেশি সাবধান হওয়া উচিত।

শুশুনিয়ার সহজ এবং মাঝারী শিলাখণ্ডে খালি হাত-পায়ে আরোহণ অবরোহণ (free hand climbing) শেখানোর পর শিক্ষার্থীদের দড়ির সাহায্যে বিলে (belay) করার কাজ দেখানো হল। দু'জন ইনস্ট্রাকটর পরস্পরের কোমরে দড়ি বেঁধে নিলেন। তারপর দু'জনে একে অপরকে দড়ির সাহায্যে বিলে করে স্ল্যাব আরোহণ করলেন। একই বিলেতে অবরোহণও করে দেখালেন শিক্ষার্থীদের।

আগেই বলেছি, আরোহণের দড়িকে বলে জীবন-রেখা বা লাইফ লাইন। শৈলারোহীর জীবন রক্ষা করে বলে দড়ির কদর অনেক। একটি দড়ির দু'জন আরোহীর একই পরিচয়। দড়িতে বাঁধা পড়ার পর তাদের আলাদা কোনো পরিচয় থাকে না। একে অপরের পরিপূরক বলে আরোহীর আলাদা সত্তা একটিতে পরিণত হয়। এক জনের বিপদ হলে অপরের বিপদ অনিবার্য। তাই যাতে সহ-আরোহী বিপদে না পড়ে তার জন্য আরোহীরা সদা সতর্ক থাকে। বিলের বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা দরকার।

বিলে (Belay)

শৈলারোহণ এবং পর্বতারোহণে বিলে একটি আর্ট। পৃথিবীর নানা দেশের পর্বতারোহী মহলে প্রতিনিয়ত 'বিলের' পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন প্রক্রিয়া। এখানে সবচেয়ে পরিচিত এবং চালু 'বিলে' করার প্রথাগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

বিলের বিশেষ উপকারিতা হল, কঠিন শিলাখণ্ডে আরোহণ-কারীর হঠাৎ পতন রোধ এবং আরোহীকে কঠিন পথ আরোহণে সাহায্য করা। বিলে করার সময় বিলের দড়ি খুবই শক্ত করে ধরা

উচিত এবং আরোহী ও বিলের সাহায্যকারীর মধ্যে দড়ি শিথিল থাকা উচিত নয়। কারণ আরোহীর হঠাৎ পতনজনিত যে প্রচণ্ড টান দড়ির ওপর এসে পড়ে তাতে আরোহী এবং বিলেকারীর উভয়ের ক্ষতি হতে পারে। ঠিক মতো বিলে করলে কারো বিপদ হবে না বা দু'জনেই শিলাখণ্ড থেকে ছিটকে পড়ার ভয় থাকবে না। বিলে করার সময় শিলার কোনো খুঁটির (anchor) সঙ্গে নিজেকে দৃঢ়বদ্ধ করে আটকে নিতে হবে। এ্যাঙকার করা থাকলে পতন জনিত প্রচণ্ড টান সামলানো যায় সহজেই।

বিলের সাহায্যে আরোহীর মনোবল দারুণ বেড়ে যায়। আরোহী যদি দেখে তার পতনের আশংকা থাকলেও কোমরের দড়ি বিলে করার ব্যবস্থা আছে তাহলে তার মানসিক সাহস অনেক বেড়ে যাবে। এই মানসিকতার জোরেই সে যে-কোনো কঠিন রক্ ফেস আবোহণের প্রয়াস চালাবে। একে 'সাইকলজিক্যাল বিলে' বলে।

বিলে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত। যথাক্রমে স্পাইক (spike), থ্রেড (thread) এবং আর্টিফিশল্ (artificial) বিলে।

স্পাইক বিলে—শিলাখণ্ডে গজালের মতো সরু অথচ সুদৃঢ় পাথরের খোঁচকে স্পাইক বলে। আরোহণের দড়ি অথবা শ্লিং গোল করে স্পাইকের ওপর দিয়ে জড়িয়ে যে বিলে করা হয় তাকে স্পাইক বিলে বলে। রক্ ফেসের ওপরে গাছের শক্ত শাখায় এই বিলে করা চলে।

ক্লাইম্বিং রোপ দিয়ে স্পাইক বিলে করতে হলে বিলেকারীর কোমরের দিকের দড়ি গোল করে (loop) স্পাইকের ওপর দিয়ে রেখে 'বো-লাইন নট' (bow-line knot) লাগিয়ে নিতে হয়। তারপর দুটো কিংবা তিনটে 'থাম নট' (thumb knot) দেওয়া প্রয়োজন। কোমরে 'ওয়েষ্ট-ব্যাণ্ড' বাঁধা থাকলে বিলে রোপ ক্যারাবিনারের সাহায্যে স্পাইকের সঙ্গে লাগিয়ে নেওয়া যায়। এ ভাবে বিলে করলে আরোহীর পতনজনিত দড়ির আকর্ষণ

বেশিরভাগই স্পাইকের ওপর দিয়ে যাবে। বিলেকারীর ছিটকে পড়ার আশংকা থাকবে না। এ্যাঙকার স্পাইক (anchor spike) বিলেকারীর কোমর অথবা পিঠের কাছে যদি না থাকে তখন ফিগার অব এইট নট (figure of eight knot) বাংলা চারের মতো গিঁট লাগিয়ে বিলে করা হয়। এই গিঁটে দড়ির গোলাকার লুপ কম রাখতে হয়। এতে স্পাইক থেকে দড়ি খুলে আসার আশংকা থাকে না।

বিলের দড়ি ছাড়া শ্লিং দিয়েও ভাল স্পাইক বিলে করা যায়। এ ক্ষেত্রে শ্লিং স্পাইকের মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে ক্যারাবিনারের সাহায্যে কোমরে লাগানো ওয়েষ্ট ব্যাণ্ডে বেঁধে নিলে পড়ে যাবার আশংকা থাকে না। প্রয়োজন মতো সম্পূর্ণ দড়িটি ব্যবহার করা যায়। শ্লিং ব্যবহার করলে ক্লাইমিং রোপের শেষ অংশ শিলাখণ্ডের ঘর্ষণে কমজোরী হয়ে যায় না। এক গাছা শ্লিং দিয়ে কখনো বিলে করা উচিত নয়, ছিঁড়ে যেতে পারে। শ্লিংকে ঘুরিয়ে জোড়া করে বিলে করা অথবা ত্নটি শ্লিং ব্যবহার করা উচিত। একটা স্পাইকে বিলে যদি নির্ভরযোগ্য মনে না হয় তা হলে ত্নটি কিংবা তিনটি স্পাইক ব্যবহার করা উচিত। অবশ্য এতে দড়ি এবং শ্লিংও লাগবে বেশি এবং ক্যারাবিনার ব্যবহার করতে হবে একাধিক। সব কিছুই প্রয়োজন বোধে প্রযোজ্য।

থ্রেড বিলে—সব থেকে নিরাপদ বিলে। থ্রেড বিলে যে-কোনো দিকে সব রকমের ভার বহন করতে সক্ষম। রক্ ফেসের ফাটলের ভেতরের গর্ত দিয়ে শ্লিং ঘুরিয়ে তাতে ক্যারাবিনার লাগিয়ে কোমরে জড়ান দড়ির সঙ্গে ক্লিপ করে নেওয়া হয়। অনেক সময় স্পাইক ভেঙ্গে আসতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক সৃষ্ট পাথরের গর্ত কখনোই খসে আসেনা তাতে যত ওজনই বহন করতে হোক না কেন।

থ্রেড বিলে সাধারণত কঠিন পাথরের অভ্যন্তরের গর্ত অথবা ত্নটি শিলাখণ্ডের সংযোগ স্থল (যার ভেতরে ফাঁক থাকে কিন্তু বাইরে

সূক্ষ্ম ফাটলের রেখা থাকে) এবং বড় ফাটলের মধ্যে আটকে থাকা প্রস্তরখণ্ড (chockstone) যা বাইরে আসতে পারেনা তার মধ্যে শ্লিং অথবা ক্লাইমিং রোপ লাগিয়ে ব্যবহার করা যায়। অবশ্য সব সময় ক্লাইমিং রোপ ব্যবহার করা যায় না নানা অসুবিধার কারণে। শ্লিং-এর ব্যবহার সবচয়ে উপযোগী।

পাথরের গর্ত ছাড়াও পাহাড়ে যে সব বৃক্ষ আছে তাতেও থ্রেড বিলে করা চলে। বৃক্ষের সুদৃঢ় শাখায় স্পাইক বিলে করা হয়, কিন্তু থ্রেড বিলে বৃক্ষকাণ্ডের ফাঁক দিয়ে দড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে করা হয়। স্পাইক বিলের মতোই থ্রেড বিলের গিঁট ব্যবহার করতে হয়।

আর্টিফিশ্যল্ বিলে—কঠিন রক্ ফেসের অনেক জায়গায় এ্যাঙকার (anchor) করার মতো স্পাইক অথবা থ্রেড থাকে না, ভাল মতো দাঁড়াবার জায়গাও থাকে না। সে সব জায়গায় আর্টিফিশ্যল্ অর্থাৎ কৃত্তিম উপায়ে বিলে করা হয়। কৃত্তিম উপায় অর্থে মজবুত এ্যালয় ষ্টীলের পিটন (piton) ব্যবহার করে স্পাইক অথবা থ্রেডের অভাব মেটান হয়।

কৃত্তিম বিলের জন্যে পিটন, পিটন হ্যামার, ক্যারাবিনার এবং শ্লিং লাগে।

রক্ ফেসের আড়াআড়ি ফাটলে (horizontal crack) বিলে দড়ির সমরেখায় পিটন লাগাতে হবে, যাতে পিটন এবং দড়ি সমকোণী (right angle) হয়। এতে পিটনের ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সিধে ফাটল (vertical crack) কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ তাতে পিটনের ভারবহন ক্ষমতা হ্রাস পায়। দেখা গেছে সিধে ফাটল ৬০০—৮০০ পাউণ্ড ওজনও বহন করতে পারেনা।

পিটনের চেটালো দিক (blade) ফাটলে অভ্যন্তরে চার ভাগের তিনভাগ হাতুড়ির আঘাতে প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়। তারপর পিটনের মাথার গোলাকার গর্তে ক্যারাবিনার লাগিয়ে তাতে শ্লিং অথবা আরোহণের দড়ি লাগিয়ে বিলে করা যায়। পিটন লাগাবার সময়

খেয়াল রাখতে হবে যাতে সবটাই ফাটলে প্রবেশ না করে যায়, তাতে পিটন খুলে নেওয়া অসুবিধাজনক হবে। পিটনের কাজ শেষ হয়ে গেলে তা খুলে নেওয়াই রীতি। পরে আবার কাজে লাগতে পারে। এ কারণে পিটনের অর্ধেক অথবা তিন চতুর্থাংশ পাথরের ফাটলে প্রবেশ করান উচিত।

ওপরের অংশে বিলেকারীর পতন রোধ করার জন্য প্রতিষেধক এ্যাঙকারের আলোচনা করা হয়েছে। এবার আরোহীকে কেমন ভাবে বিলের দড়ি দ্বারা আরোহণে সাহায্য করা হয় সে কথা বলব।

বডি (body), শোলডার (shoulder) এবং হিপ (hip) বিলে খুবই প্রচলিত। এ ছাড়াও রানিং বিলে (running belay) ব্যবহার করা হয়।

সাধারণতঃ প্রথম আরোহীকে দ্বিতীয় আরোহী আরোহণে সাহায্য করার জন্য বডি বিলে ব্যবহার করে। প্রথম আরোহী আরোহণ শুরু করার আগে দ্বিতীয় আরোহী নিজেকে এ্যাঙকার করে নেয়। তারপর প্রথম আরোহীর দিকের দড়ি পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে দু'হাতের মুঠোয় ধরে আরোহীকে আরোহণের অনুমতি দেয়। বিলেকারীর ফুলহাতা জামা এবং হাতে চামড়ার দস্তানা পরা থাকে। প্রথম আরোহী আরোহণ শুরু করলে বিলেকারী আস্তে আস্তে দড়ি ছাড়ে। আরোহীর দড়ি যাতে পাথরের খাঁজে আটকে না যায় সেদিকে বিলেকারীর প্রখর দৃষ্টি থাকে। আরোহীর পতন ঘটলে দড়ির ঘর্ষণে পুরা হাতা জামা এবং দস্তানার থাকার জন্য হাতের কোনো ক্ষতি হবে না।

শোলডার বিলে—প্রথম আরোহী দ্বিতীয় আরোহীকে সাহায্য করার জন্য শোলডার বিলে করে। আরোহীর দড়ি বিলেকারীর ডান অথবা বাঁ বগলের নিচ দিয়ে পিঠ ঘুরে বাঁ অথবা ডান কাঁধের ওপর দিয়ে আসে। প্রথম আরোহীকে শোলডার বিলে করা উচিত নয়, কারণ ওপর থেকে দড়িতে টান পড়লে বিলেকারীর বগলের নিচ

দিয়ে যাওয়া দড়ি উপরে উঠতে চাইবে এবং এর ফলে দুর্ঘটনা হতে পারে। নিচ থেকে কাউকে তোলার জন্য ওপরের আরোহীর শোলডার বিলে করা সহজ কারণ সমস্ত ওজনই তার কাঁধের ওপর রাখা থাকে।

হিপ বিলে—একে ওয়েষ্ট (waist) বিলেও বলে। এই বিলে প্রায় বডি বিলের সমগোত্রীয়। তবে হিপ বিলে প্রথম আরোহীকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় আরোহীকে আরোহণে সাহায্য করা হয় হিপ বিলে দিয়ে। আরোহীর দড়ি কোমর ঘুরে দু'হাতের শক্ত মুঠোয় ধরা হয়। যে হাতে আরোহীর দিকের দড়ি ছাড়া হয় তার বিপরীত হাতে দড়িটি একটা পাক দিয়ে নিতে হয়। এতে দড়ি হাত ফস্‌কিয়ে বিপদ ঘটাতে পারে না। আরোহীর সব ভার বিলেকারীর কোমরের ওপরে থাকে। হিপ বিলে করার সময় কোমরের ওয়েষ্ট ব্যাণ্ড (যদি নাইলনের হয়) জামা এবং সোয়েটার দিয়ে ঢেকে নিতে হয়। কারণ নাইনলের ওয়েষ্ট ব্যাণ্ডের সঙ্গে নাইলনের বিলে রোপের ঘর্ষণে ওয়েষ্ট ব্যাণ্ড গলে যেতে পারে।

রানিং বিলে—সাধারণত প্রথম আরোহীর পতনজনিত আঘাত এড়াবার জন্য রানিং বিলে করা হয়। পরে সেই বিলে অন্য আরোহীদেরও সাহায্য করে। রানিং বিলে অন্তত দশ থেকে বিশ ফুট অন্তর অন্তর লাগানো উচিত। প্রথম আরোহীর পতন ঘটলে রানারের জন্য সে মাত্র দশ অথবা বিশ ফুট নিচে পড়ে যাবে এবং তাতে আঘাত লাগবে খুবই সামান্য। কিন্তু রানারের দূরত্ব যদি বেশি হয় তাহলে তার পতনের দূরত্ব অনেক বেশি বাড়বে।

খাড়াই রক্ ফেসের কোণ অথবা সুবিস্তৃত ঝোলাপাথরে (overhang) আড়াআড়িভাবে (traverse) পার হবার সময় রানিং বিলে বিশেষ কার্যকরী। এই বিলেতে আরোহীর মনোবল খুব বেড়ে যায়।

রানিং বিলে করার জন্য এক গাছা শ্লিং রক্ ফেসের বেরিয়ে থাকা স্পাইকে অথবা গাছের শাখায় ঝুলিয়ে দিয়ে ক্যারাবিনারের সাহায্যে

শ্লিং এবং ক্লাইমিং রোপ ক্লিপ করে নিতে হয় যাতে ক্যারাবিনারের মধ্য দিয়ে পুলির মতো দড়ি চলাচল করতে পারে। স্পাইকের চেয়ে ভাল রানিং বিলে হয় থ্রেডের সাহায্যে। পাথরের গর্ত বা গাছের গুঁড়ির ওপরে পাক দিয়ে শিলিং লাগিয়ে ক্যারাবিনারের সাহায্যে রানিং বিলে করা হয়। স্পাইক অথবা থ্রেড বিলের অসুবিধা থাকলে পিটন লাগিয়ে এ্যাঙকার তৈরি করে শ্লিং ও ক্যারাবিনার দিয়ে রানিং বিলে করা যায়। রানিং বিলের ক্যারাবিনারে আরোহীর কোমরের দড়ি লাগিয়ে নিতে হয়।

।। সাত ।।

শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদের নানা রোপে ভাগ করা হল। এক একটা রোপে ছয়জন করে শিক্ষার্থী। তাদের ছুটো আরোহণের দড়ি, প্রত্যেকের কোমরে একটি ম্যানিলা আঁশের তৈরি ½ ইঞ্চি পুরু শ্লিং, একটা, স্ক্রু-করা ক্যারাবিনার এবং এক জোড়া চামড়ার দস্তানা আছে। ওদের সবার পরণে পুরোহাতা জামা, সোয়েটার ও পশমের তৈরি ফুল প্যান্ট। পায়ে হানটার জুতা এবং মোজা।

ইনস্ট্রাকটর বাসন্তী স্বপন এবং নিমাই নামের তিনজন শিক্ষার্থীকে 'একটি রোপে' আরোহণ করতে বললেন। নাইলনের তৈরি দড়িটির দৈর্ঘ্য একশ কুড়ি ফুট এবং পরিধি ১½ ইঞ্চি। এটি কেবল্ড রোপ। এর ছুই প্রান্তে ছু'জন এবং মাঝখানে একজন বাঁধা থাকবে। দড়ি কোমরে বাঁধা হয়ে গেলে ওরা তিনজন এক এবং অভিন্ন। অর্থাৎ ওদের কোনো আলাদা অস্তিত্ব থাকবে না। একজনের প্রাণের জন্য আর একজন দায়ী। একজন ছুর্ঘটনা ঘটালে অপর জন তাকে রক্ষা করবে। যদি রোপের অংশীদারকে সে রক্ষা করতে না পারে তাহলে রোপ তাকে রক্ষা করবে না। তিনজনই বিপদে পড়বে এক সঙ্গে। এই জন্য রোপকে পর্বতারোহণের পরিভাষায় বলে লাইফ লাইন।

বাসন্তী নিমাই আর স্বপন দড়িটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে নিল। দেখে নিল কোনো ছেঁড়া ফাটা আছে কিনা। ছেঁড়া অথবা জীর্ণ দড়ি নিয়ে শৈল্যারোহণ করা আত্মহত্যার সামিল। কারণ রক্ ফেসের ধারালো পাথরে ঘষে দড়ির জীর্ণ অংশ যে কোনো সময় ছিঁড়ে যেতে পারে। এরকম দড়ি ছিঁড়ে বহু ছুর্ঘটনা হয়েছে আর এতে অনেক প্রাণও গেছে অকালে।

একশ কুড়ি ফুটের ক্লাইমিং রোপটির প্রথমে বাসন্তী, মাঝে স্বপন

এবং শেষে নিমাই কোমরে দড়িটিতে গিঁট বেঁধে নিল। বাসন্তী এবং নিমাই এণ্ডম্যান নট এবং স্বপন মিডলম্যান অথবা ডাবল নট লাগাল। বাসন্তী দড়ির আগে আর স্বপন শেষে। বাসন্তী রোপ লিডার।

কঠিন শিলাখণ্ডটি প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু। ওরা তিনজনে কি যেন আলাপ করে নিল। তারপর বাসন্তী নিমাই আর স্বপনকে কিছু নির্দেশ দিয়ে আরোহণ শুরু করল।

শিলাখণ্ডের কোন জায়গাটা দিয়ে ওঠা সহজ এবং কম বিপজ্জনক তা দেখে নিয়ে বাসন্তী ওঠা শুরু করল। ছোট ছোট ফাটল আর গর্ত যথেষ্ট আছে। ফাটল খুঁজে তাতে হাত রাখছে, তারপরই পা রাখার সুবিধে মতো জায়গা দেখে নিয়ে পা রাখছে। কখনো ফাটল আর গর্তে জমে থাকা ধুলো বালি পরিষ্কার করছে, কখনো ছোট ছোট আগাছা আর ঘাস ছিঁড়ে আরোহণের পথ সাফ করে নিচ্ছে। ফাটলে ধুলো-বালি ঘাস আগাছা থাকলে হাত-পা পিছলে যেতে পারে। আর একবার যদি হাত বা পা পিছলায় তাহলে পপাতধরণীতল। হাত-পা ভেঙ্গে হাসপাতাল বাস ঠেকায় কে?

ওরা যখন আরোহণ করছে তখন নিচে কয়েকজন শিক্ষার্থী নিজেদের মধ্যে হাসি-তামাসা করছিল। ইনস্ট্রাকটর অনুচ্চ গলায় তাদের ধমক দিয়ে বললেন—ক্লাইম করার সময় গোলমাল করা উচিত নয়। তোমাদের হাসি-ঠাট্টায় ওদের এ্যাটেনশন নষ্ট হতে পারে। অ্যাকসিডেন্ট হওয়াও বিচিত্র নয়।

শিক্ষার্থীরা লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল। এ কথাগুলো ওদের সকালের লেকচারেই বলা হয়েছে।

আরোহণ-অবরোহণের সময় মনঃসংযোগ অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো হওয়া চাই। না হলে বিপদ।

কঠিন শিলায় ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে বাসন্তী। নিচে মিডলম্যান

অর্থাৎ দ্বিতীয় আরোহী। স্বপন হাতের অতিরিক্ত কয়েল করা দড়ি ছাড়ছে একটু একটু। ও বাসন্তীকে বডি বিলে করছে। দড়িটাকে পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে দু'হাতে ধরে আছে। রক্ ফেসের নিচের জমিতে থাকায় ওদের কোনো এ্যাঙকার করতে হয়নি। নিমাই আরো কিছুটা তফাতে ওর এবং স্বপনের দিকের দড়ি কয়েল করে ধরে অপেক্ষা করছে।

অনেকটা উঠে বাসন্তী ক্লান্তি অনুভব করল। হাঁপিয়ে গেছে। বিশ্রাম দরকার। বিশ্রাম না নিলে আরোহণের ধকল সামলাতে পারবে না। ওপরে তাকিয়ে দেখল ফুট তিনেক উঁচুতে একটা বড়সড় ফাটলের গা দিয়ে বড় একটা অশ্বথ গাছ বেরিয়েছে।

গাছের পাশে জনাতুয়েকের কোনো রকমে দাঁড়াবার জায়গা আছে। ওখানে গেলে খানিকটা বিশ্রাম নিতে পারবে। তা ছাড়া দ্বিতীয় আরোহী স্বপনকে ওপরে আনা দরকার। না হলে বাসন্তী আর এগুতে পারবে না, দড়ি কম পড়বে।

অশ্বথ গাছটার নিচে এসে পৌঁছল বাসন্তী। ওখানে এসেই দেখল চারিদিক। যেদিক দিয়ে ও উঠেছে তা সত্যি ভয়াবহ। ওঠার সময় বুঝতে পারেনি। স্বপনকে ভালমত বিলে করা দরকার। ঠিকমত বিলে না করলে তুজনের বিপদ হতে পারে। যে জায়গাটায় ও নিজে দাঁড়িয়ে আছে তা মোটেই ভাল জায়গায় নয়। দাঁড়িয়ে বিলে করলে বিপদ হতে পারে। বসতে পারলে হিপ বিলে করতে পারত। হিপ বিলের সুবিধে এই যে, দড়িটা কোমরের ওপর দিয়ে ঘুরে হাতের মধ্যে থাকে এবং তুই উরুতের ওপর হাতের ভার রাখা যায়। এতে দড়িতে ঝাঁকুনি পড়লেও নিজে ছিটকে পড়ার ভয় থাকে না।

'একটির সুবিধে না থাকলে আরো অনেক রকম কলাকৌশল আছে। শৈলারোহণে যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা করে নিতে হয় শৈলারোহীকে। বাসন্তীও বিকল্প কিন্তু সবচেয়ে ভাল পন্থা নিল।

ম্যানিলার তৈরি স্লিং নিয়ে মোটা অশ্বত্থ গাছের গায়ে পাক খাইয়ে কোমরে বাঁধা ওয়েষ্ট ব্যাণ্ডের সঙ্গে ক্যারাবিনার দিয়ে আটকে ফেলল, এতে ওর শরীর গাছের শক্ত গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রইল। সামান্য একটুখানি জায়গায় ও এখন দাঁড়িয়েও বেশ স্বস্তি বোধ করছে। এভাবে বিলে করাকে 'থ্রেড বিলে' বলে।

এবার স্বপনের সঙ্গে ওর যে নাইলনের দড়িটায় রোপ করা আছে তা ওর নিজের ডান বাহুর নিচ দিয়ে পিঠ ঘুরে বাঁ-কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বাঁ হাতের শক্ত মুঠোয় ধরল। এবার দুহাতে চামড়ার দস্তানা পরে নিয়ে স্বপনকে বিলে করার জন্য প্রস্তুত হল। একে বলে 'শোল্ডার বিলে'।

—স্বপন, বিলে রেডি। বাসন্তী তৈরি হয়ে আরোহণের নির্দেশ দিল।

—উঠব? স্বপন জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ।

—উঠছি। বিলে টাইট করো।

স্বপন লিডারের নির্দেশ পেয়ে আরোহণ শুরু করল। একই ভঙ্গী, একই সার্থকতা। বাসন্তী স্বপনের কোমরের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা ওর ওঠার সঙ্গে তাল রেখে টেনে যাচ্ছে ডান হাতে, আর বাঁহাতে তা কিছুটা তফাতে সরিয়ে দিচ্ছে।

এদিকে নিমাই অর্থাৎ তৃতীয় আরোহী স্বপনের জায়গায় দাঁড়িয়ে বডি বিলে করা শুরু করল। হাতের গোটানো দড়ি স্বপনের আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে একটু করে ছাড়তে থাকল। ওর লক্ষ্য যাতে রক্ ফেসে স্বপনের বিলে রোপ আটকে না যায় কোথাও।

স্বপন নিশ্চিন্ত হয়ে ওপরে উঠছে। লিডার যে ওর কোমরের দড়িটা বেশ ভালভাবেই বিলে করছে তা ও জানে। পড়ার ভয় নেই। হঠাৎ ও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপরই পাদুটো যেন কেমন কেঁপে উঠল। একটা ফাটলে হাতের আঙুল দিয়ে ধরার চেষ্টা

করল কিন্তু হাত ফসকে যাচ্ছে। আর একটু ওপরে একটা ভাল ক্যাটল অর্থাৎ ইন কাট হোল্ডস্ দেখেই তড়িঘড়ি সেটা ধরতে গিয়ে হাত-পা দুটোই স্লিপ করে গেল। চোখে অন্ধকার দেখল স্বপন। আত্মবিশ্বাসবোধটা কেমন যেন ভেঙ্গে পড়ছে। নিচে এবড়ো খেবড়ো পাথর। ওখানে ছিটকে পড়লে মাথা গুঁড়িয়ে যাবে। গায়ে ঘাম দিচ্ছে। এলোপাথাড়ি কঠিন শিলাখণ্ডে কিছু একটা ধরে পতন রোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। না, হাত-পা কেমন যেন অবশ হয়ে গেছে ওর। শরীর শিথিল। অসম্ভব হাঁপাচ্ছে স্বপন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ও খাড়া পাথুরে পাঁচিল থেকে হড়হড় করে গড়িয়ে পড়ল। প্রাণের তাগিদে চিৎকার করে লিডারের উদ্দেশ্যে বলল, সাবধান, স্লিপ করে গেছি।

—ঘাবড়ো না স্বপন। বিলে ঠিক আছে। ট্রাই কেয়ারফুলি।

বাসন্তী জবাব দিয়ে বিলের দড়িটা আরো শক্ত করে ধরল। স্বপন হঠাৎ স্লিপ করায় বিলের দড়িটায় প্রচণ্ড টান পড়েছিল। কিন্তু পিছনের শক্ত অশ্বত্থ গাছটায় স্লিং দিয়ে ওর কোমরের সঙ্গে এ্যাঙ্কার (anchor) করা থাকায় বিলের দড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকুনিও কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। কি ভাগ্যিস থ্রেড বিলে নট লাগিয়ে নিয়েছিল সময় মতো তাই রক্ষা! না হলে দড়ির ঝাঁকুনিতে দুজনেই ছিটকে পড়ত নিচে!

স্বপন নিজের অন্যমনস্কতায় দারুণ লজ্জা পেল। লিডারের জন্য ওর প্রাণ বাঁচলো। এরপর খুব সাবধানে কঠিন রক্ ফেস পার হয়ে পৌঁছে গেল বাসন্তীর কাছে।

স্বপন ওর জায়গায় এসে যাওয়ায় বাসন্তী আরো ওপরে নিরাপদ স্থানে আরোহণ করা মনস্থ করল। স্বপনকে বলল, ওখানে থেকে নিমাইকে বিলে করতে। নিমাই উঠে এলে স্বপন যেন জানায় ওকে।

স্বপন বলল, তোমায় বিলে করতে হবেনা?

—দরকার নেই। আমি রানিং বিলে করে নেব দরকার হলে। পথ বেশ সহজ বলেই মনে হচ্ছে।

স্বপন ওর শ্লিং বাসন্তীকে দিয়ে দিল। নিজের ওয়েষ্ট ব্যাণ্ড খুলে অশ্বত্থ গাছে জড়িয়ে থ্রেড বিলে নট লাগিয়ে কোমরের মিডল-ম্যান বিলে দড়িতে একটা লুপ বানিয়ে ক্যারাবিনার দিয়ে আটকে নিল। তারপর নিমাইকে বিলে করার জন্য প্রস্তুত হল।

নিচ থেকে নিমাই এবং ওপরে বাসন্তী আরোহণ শুরু করল যুগপৎ। নিমাই সহজেই উঠে এলো স্বপনের কাছে।

বাসন্তী রক্ ফেস বেয়ে ফুট দশেক ওঠার পর একটা ভাল পাথরের স্পাইক দেখে তাতে শ্লিং জড়িয়ে ক্যারাবিনার দিয়ে শ্লিং আর কোমরের বিলে রোপ আটকে নিল। অনেকটা আশ্বস্ত হল বাসন্তী। এখান থেকে পড়ে গেলে ও মাত্র দশ ফুট পড়বে। তারপর বাকি পথটুকু আরোহণ করে শিলাখণ্ডের শীর্ষে গিয়ে পৌছল।

স্বপন এবং নিমাই পরস্পরকে বিলে করে কঠিন রক্ ফেসের বাকি পথ অনায়াসেই পার হয়ে শৈল প্রাচীরের শীর্ষে উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে গিয়ে পৌছল।

ইনস্ট্রাকটর ওদের আরোহণের দোষ ত্রুটি বুঝিয়ে দিলেন অপর শিক্ষার্থীদের। স্বপন অমনোযোগী হওয়ায় এবং ঠিক মতো হ্যাণ্ড হোল্ডস্ ব্যবহার না করায় শ্লিপ করে গিয়েছিল। আরোহণের আগে তাই ভালভাবে হোল্ডস্ দেখে নেওয়া উচিত।

ওদের দেখে অন্য শিক্ষার্থীদের সাহস বাড়ল। ওরা প্রতি দড়িতে তিনজন করে কঠিন শিলাখণ্ডের নানা দিক দিয়ে শীর্ষে উঠে এলো।

দুপুরে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পে ফিরে এলো। ওদের মধ্যে আজকের কঠিন আরোহণ খুবই উৎসাহ যুগিয়েছে। কেউ কেউ ইনস্ট্রাকটরদের

জিজ্ঞাসা করেছে আগামীকাল ওদের আরো কঠিন রক্ ফেসে উঠতে দেওয়া হবে কি না।

শৈলারোহণ যেমন কষ্টসাধ্য এবং বিপদসঙ্কুল, তেমনই উত্তেজনা-পূর্ণ। মনের সাহস আর স্থির প্রতিজ্ঞা থাকলে যে কোনো ছেলে-মেয়েই শৈলারোহণের মধ্যে আনন্দের আর উত্তেজনার খোরাক পেতে পারে।
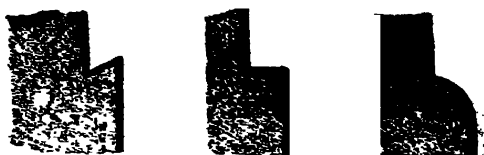
বামে—ইনকাট্ হোল্ড
মধ্যে—ফ্ল্যাট হোল্ড
ডাইনে—রাউণ্ডেড হোল্ড
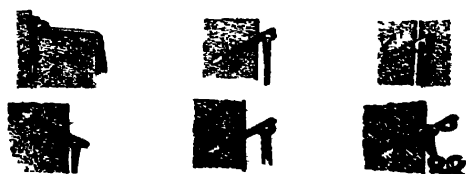
বিভিন্ন ফাটলে পিটনের ব্যবহার

বিভিন্ন ফাটলের মধ্যে পিটন ও স্লিং-এর সাহায্যে এ্যাবসেল এ্যাঙ্কার। দ্রুত অবতরণের জন্য এই এ্যাঙ্কার খুবই উপযোগী।

বিভিন্ন ধরণের হ্যাণ্ড হোল্ড

হ্যাণ্ড জ্যাম্

থ্রেড বিলে নট্

বোলাইন নট্

স্পাইক বিলে নট্

স্পাইক বিলে নট্

॥ আট ॥
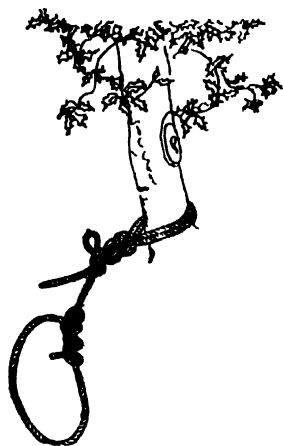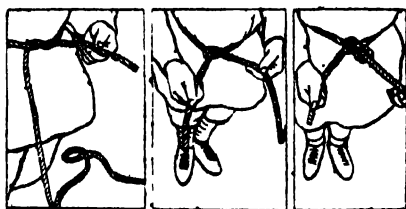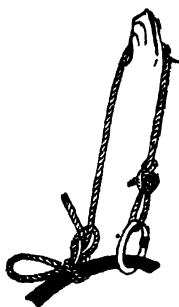
পরদিন সকালে শিক্ষার্থীরা শিবির থেকে ইনস্ট্রাকটরের সঙ্গে তাদের নিজের নিজের রোপে ভাগ হয়ে পরপর রক্ ফেসে এসে পৌঁছয়। আজকের নতুন কার্যক্রম শুরু করার আগে শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হল গতকালের শিলাখণ্ডে আরোহণ-অবরোহণ অভ্যাস করতে।

শিক্ষার্থীরা নিজের নিজের রোপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন শিলাখণ্ডে আরোহণ-অবরোহণ শুরু করল।

শুশুনিয়া পাহাড়ের সহজ এবং কঠিন শিলায় বারবার আরোহণ-অবরোহণ করতে করতে শিক্ষার্থীদের সাহস ও মনোবল দারুণ বেড়ে গেছে। ওরা আর আগের মতো কঠিন রক্ ফেস দেখে ভয় পায় না। বরং সাহসের সঙ্গে আরোহণ করার চেষ্টা করে বিলে ছাড়াই।

ইতিমধ্যে ইনস্ট্রাকটররা সবচেয়ে বড় এবং খাড়াই শিলাখণ্ড (vertical rock-face) পরিদর্শন করে ঠিক করলেন শিক্ষার্থীদের ভার্টিক্যাল রক্ ফেস আরোহণ করাবেন। এটি কোণাকোণি ৯০ ডিগ্রি খাড়াই।

শিক্ষার্থীদের নব্বুই ডিগ্রি খাড়া শৈল-প্রাচীরের সামনে ডাকা হল। ওরা রক্ ফেসটি আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে দেখল, হাত দিয়ে ধরার এবং পা রাখার মতো হ্যাণ্ড হোল্ডস্ ও ফুট হোল্ডস্ থাকলেও, রক্ ফেসটা একেবারে দেওয়াল যেন। মাঝখানে প্রায় পনেরো ফুট ওপরে এক জায়গায় দেওয়ালের ফুট চারেক অংশ সামনের দিকে ঝুঁকে আবার সিধে খাড়াই উঠে গেছে। এই ঝুলে থাকা অংশটিকে বলে ওভার-হ্যাং (over-hang)।

বিরাট খাড়াই রক্ ফেসের চেহারা দেখে শিক্ষার্থীদের এবার সত্যি সত্যি গায়ে ঘাম দিচ্ছে। এমন একটা ভাল জায়গা নেই যেখানে দাঁড়িয়ে বিলে করা যেতে পারে, অথবা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। এ্যাঙ্কার করার মতো তেমন নির্ভরযোগ্য স্পাইক অথবা থ্রেড করার মতো পাথর বা গাছ, কিছুই নেই।

ইনস্ট্রাকটর শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিলেন রক্ ফেসের অবস্থা। বললেন, খাড়া প্রাচীর বা ভার্টিক্যাল রক্ ফেস আরোহণ করতে হলে পিটন, হাতুড়ি এবং ক্যারাবিনার ব্যবহার করতে হয় প্রয়োজন মতো। ক্লাইমিং রোপ, শ্লিং ও চামড়ার দস্তানা তো থাকবেই।

পিটন (Piton) লোহার তৈরি বড় পেরেক। পিটনের একদিক সরু এবং অপর দিক চওড়া। সরু থেকে চ্যাপ্টা প্লেটের মতো চওড়া হয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেটিকে পিটন-হেড বা মাথা বলে। প্লেটের মাথার কাছে একটা বড় গর্ত থাকে। পিটনের সরু দিকটায় করাতের মতো দাঁত থাকে। শৈল প্রাচীরের ফাটলে পিটনের সরু দিক পিটন-হাতুড়ির সাহায্যে বসিয়ে দিয়ে কঠিন অংশ আরোহণ-অবরোহণ করা সহজ এবং বিপদ-মুক্ত হয়।

ক্যারাবিনার (Karabiner) এ্যালয় অথবা স্টীলের তৈরি ডিম্বাকার অথবা ইংরেজি ডি (D) আকারের কপিকল বিশেষ। ক্যারাবিনার দু'রকমের—একটি স্ক্রু টাইপ, অপরটি প্লেন। এর একদিকে স্প্রিং-এর গেট আছে। সেই গেটটি বন্ধ করার জন্য আর একটি ধাতু স্ক্রু করা আছে। এটি বন্ধ করলে আর গেট খুলে যাবার ভয় থাকে না। প্লেন ক্যারাবিনারেও স্প্রিং গেট আছে তবে গেট বন্ধ করার জন্য কোনো স্ক্রু- করার বন্দোবস্ত নেই। দু'রকম ওজনের ক্যারাবিনার ব্যবহৃত হয়। যেমন—হেভি ক্যারাবিনার ওজন আট আউন্স এবং লাইট ক্যারাবিনার ওজন চার আউন্স।

ইনস্ট্রাকটর এক নম্বর রোপের তিনটি ছেলেকে ডাকলেন।

ওদের মধ্যে স্বাস্থ্য এবং দৈহিক সামর্থে শক্ত যে ছেলেটি তাকে দিলেন নেতৃত্বের দায়িত্ব। ওর আত্মবিশ্বাস আর সাহস আগেই যাচাই করে নিয়েছেন উনি। এভাবে পরপর আরো দুটি ছেলেকে দ্বিতীয় ও শেষ আরোহীর জায়গা নিতে বললেন।

শিক্ষার্থীরা প্রথমে একশ বিশ ফুটের নাইলন ক্লাইম্বিং দড়িটা পরীক্ষা করে দেখে নিল যে দড়িটার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক আছে। এটির ওজন প্রায় পাঁচ পাউণ্ড এবং ১৮ ইঞ্চি পরিধি। দড়িটির ভার সহ্য করার ক্ষমতা প্রায় চার হাজার দু'শ পাউণ্ড। অর্থাৎ যে কোনো ঝাঁকুনি যদি এই ওজনের মধ্যে হয় তাহলে দড়ি অটুট থাকবে, বেশি হলে ছিঁড়ে যাবে।

এরপর ওরা ম্যানিলা দড়ির ওয়েষ্ট ব্যাণ্ডে দুটো করে ক্যারাবিনার, চারটে রক্ পিটন, হাতুড়ি, একটি নাইলনের শ্লিং, চামড়ার দস্তানা ঝুলিয়ে নিয়ে তৈরি হল। ক্লাইম্বিং দড়িটাকে ইংরাজীর ভি-এর মতো ভাঁজ করে দড়ির প্রথমে দলের নেতা মাঝে দ্বিতীয় আরোহী এবং শেষে তৃতীয় আরোহী দাঁড়াল। ওরা অর্থাৎ দড়ির প্রথম ও শেষজন এণ্ড-ম্যান নট এবং মাঝেরজন মিডল-ম্যান নট লাগিয়ে কোমরের সঙ্গে দড়িটা শক্ত করে বেঁধে নিল। দড়িতে ওরা একটা ছোট লুপও লাগিয়ে নিল।

বোলাইন (bowline) এবং টারবাক (tarbuck) নটকে এণ্ড-ম্যান নটও বলে। যেহেতু দড়ির দু'প্রান্তের আরোহীকে একই নট দ্বারা বাঁধা হয় তাই 'এণ্ড-ম্যান' নটের নামকরণ। বর্তমানে বোলাইন এবং টারবাক নটের পরিবর্তে ইংরাজী আট-এর আকারে 'ফিগার-অব-এইট' (figure of eight) নট খুবই প্রচলিত। এই গিঁট ক্যার্ন্‌ম্যান্‌টেল দড়িতেও ব্যবহার করা চলে। গিঁট সহজে আলগা হয়ে যায় না। বোলাইন এবং টারবাক নটের চেয়েও মজবুত। মিডলম্যানের ক্ষেত্রেও এই নট ব্যবহার করা চলে। তাছাড়াও এই নট দিয়ে এ্যাঙ্‌কার করাও চলে। সবচেয়ে সুবিধা হল চটপট এই নট বানানো যায়।

তিনজন আরোহীই এণ্ড-ম্যান এবং মিডল-ম্যান নট হিসাবে 'ফিগার-অব-এইট' নট পছন্দ করে দেখলাম। দ্বিতীয় আরোহী ইচ্ছা করলে ওভারহ্যাণ্ড (overhand) নট লাগাতে পারতো, কিন্তু ওকেও দেখলাম 'ফিগার-অব-এইট' নট লাগাতে।

প্রথম আরোহী অর্থাৎ নেতা হল প্রদোষ, দ্বিতীয় বরুণ এবং শেষ আরোহী সজল। প্রদোষ এবং বরুণের মধ্যে যে দড়ি আছে তা বরুণ কয়েল অর্থাৎ গোল করে গুটিয়ে নিল। কয়েল করার সময় দু' হাতে দড়ি ধরে হাত দুটো দু'পাশে কাঁধের সমান্তরালে সোজা করে যতটা দড়ি হাতের মধ্যে এলো তা গোল করে নিল। এই ভাবে প্রদোষের দিকের দড়ি হাতের মধ্যে কয়েল করে নিল বরুণ। এতে দড়ির ক্ষতি রোধ হয়। দড়ি জমিতে পড়ে থাকলে জড়িয়ে যেতে পারে অথবা পাথর খণ্ড পড়ে দড়ির ক্ষতি হতে পারে। সজলও বরুণের দিকের দড়ি একইভাবে কয়েল করে নিল।

শৈলারোহী দলের নেতা প্রদোষ সহ-আরোহীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে কঠিন রক্ ফেসের সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল আশপাশ। তারপর মিডলম্যান বরুণকে বলল, ক্লাইমিং। আরোহণ শুরু করছি।

—ঠিক আছে, ও.কে। জবাব দিল বরুণ।

প্রদোষ শৈলপ্রাচীরের ফাটল অর্থাৎ হোল্ডস্ ধরে উঠতে লাগল। বরুণ হাতের গোটানো দড়ি জমিতে রেখে প্রদোষের দিকের দড়ি পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে দু'হাতে শক্ত করে ধরে বডি বিলে করে দড়ি একটু একটু ছাড়তে লাগল। তৃতীয় ও শেষ আরোহী সজল চুপচাপ কিছুটা দূরে একটা পাথরে ঠেস দিয়ে বসে প্রদোষের আরোহণ দেখছে।

প্রদোষ দশ-বারো ফুট উঠে গিয়ে দেখল আর আরোহণ করা যাচ্ছে না। নব্বুই ডিগ্রি খাড়া রক্ ফেসের ওখানে ধরার মতো একেবারেই কোনো হোল্ডস্ নেই। ফাটল আছে বটে, তবে তা

এত সূক্ষ্ম যে হাতের আঙ্গুল ঢোকে না তার মধ্যে। পিটন লাগাতে হবে।

—বিলে টাইট। পিটন লাগাব।

প্রদোষের সাবধান বাণীর জবাবে বরুণ বলল, হ্যাঁ, বিলে ঠিক আছে।

প্রদোষ কিছুটা নেমে এসে ভালভাবে পা রাখার একটা জায়গায় দাঁড়াল। পাহাড়ের গায়ে দেহের ভারসাম্য রেখে দিয়ে কোমরের ওয়েষ্ট ব্যাগে ঝোলানো ক্যারাবিনারের গেট খুলে একটা পিটন এবং হাতুড়ি বার করল। পাহাড়ের গায়ে সরু ফাটলের মধ্যে আড়াআড়ি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মাপে হেলিয়ে পিটনটা লাগিয়ে হাতুড়ির ঘায়ে ভেতরে বসিয়ে দিলো। পিটন লাগানো হয়ে গেলে তাকে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল আলগা কিনা। না, ভালই বসে গেছে। খুলে আসার ভয় নেই। ওয়েষ্ট ব্যাগ থেকে একটা ক্যারাবিনার খুলে পিটনের মাথায় যে গর্ত আছে তার ভেতর দিয়ে ক্যারাবিনারের গেট খুলে আটকে দিলো। এবার ওই ক্যারাবিনার ধরে অক্লেশে উঠে গেলো কঠিন জায়গাটা।

ক্যারাবিনার ধরে ওঠার সময় নিজের কোমরের ক্লাইমিং বিলে রোপ ক্যারাবিনারের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে নিল। এতে ওর লাভ হল অনেক। কারণ যদি পা-হাত ফসকে যায় তা হলে পড়বে মাত্র দু'চার ফুট—দশ-বারো ফুট নয়। কারণ, মাঝখানের ওই ক্যারাবিনারে ওর দড়ি আটকে থাকবে যদি পড়ে যায়। পিটন এবং ক্যারাবিনারের সাহায্যে প্রদোষ মাঝপথে যে বিলের ব্যবস্থা করল তাকে রানিং বিলে বলে। রানিং বিলের ক্যারাবিনার এ-ক্ষেত্রে পুলির কাজ করবে।

খুব সাবলীল ভাবে উঠে চলেছে প্রদোষ। নিচে বরুণ দড়ি ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ প্রদোষকে সাবধান করল—বিলে শেষ হয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে প্রদোষ প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট উঠে গেছে।

বিলের দড়ি শেষ হয়ে গেলে আর আরোহণ করা যাবে না। তাই দেখল আশপাশ। ফুট পনেরো ওপরে অনেকটা জায়গা আছে। তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ওর এবং বরুণের মধ্যে যে দড়িটা আছে তাতে অতটা ওঠা যাবে না। এখন উপায়?

কঠিন শিলাগাত্রেও অজস্র উপায় থাকে। প্রদোষ দেখল ফুট পাঁচেক ওপরে দাঁড়াবার মতো জায়গা আছে। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে বিলে করা বেশ বিপজ্জনক। হঠাৎ নজরে পড়ল পাহাড়ের গা থেকে একটা খোঁচা মতো পাথর বেরিয়ে আছে। ব্যস ভাবনা নেই। ওটাতেই কাজ হবে।

জায়গাটায় উঠে এলো প্রদোষ। এসেই খোঁচা মতো পাথরটা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল বেশ শক্ত। সেই খোঁচা মতো পাথর যাকে শৈলারোহণের পরিভাষায় বলে স্পাইক তাতে একটা লঙ স্লিং-কে ডবল করে ঝুলিয়ে দিয়ে ক্যারাবিনারের সাহায্যে নিজের কোমরের ওয়েষ্ট ব্যাণ্ডে লাগিয়ে নিল। জায়গাটা বিপজ্জনক হলেও ওর পড়ে যাবার ভয় নেই।

তারপরই ও বরুণকে বলল, উঠে এসো।

—উঠছি। বিলে করো। লিডারের উদ্দেশ্যে কথাটা বলে বরুণ প্রদোষের পথেই আরোহণ শুরু করল।

ওদিকে প্রদোষ হিপ বিলে (দড়ি কোমরের ওপর নিয়ে) করছে নিজের আর বরুণের দড়িটায়। সজল হাতের কয়েল করা দড়ি ছাড়ছে নিচ থেকে ধীরে ধীরে। সজল বডি বিলে করছে।

বরুণ এবার পিটন লাগানো জায়গাটায় এসে এক হাতে পিটন ধরে অপর হাতের বুড়ো আঙ্গুলের চাপে ক্যারাবিনারের গেট খুলে নিজের আর প্রদোষের মধ্যে বাঁধা দড়িটা বার করে নিয়ে সজলের সঙ্গে যে অংশ বাঁধা আছে তা লাগিয়ে নিল। এটা না করলে ও আটকা পড়ে যেত। কারণ একই দড়ির মাঝখানে ও আটকা আছে।

ধীরে ধীরে বরুণ যখন প্রদোষের পাশে এসে দাঁড়াল তখনই প্রদোষ নিজের ওয়েষ্ট ব্যাণ্ডে লাগানো স্পাইক বিলের ক্যারাবিনার খুলে নিয়ে স্পাইকের সঙ্গে বরুণকে বেঁধে দিল। ইতিমধ্যে বরুণ ওর শ্লিং প্রদোষকে দিয়ে দিল। এতে নট লাগাবার সময়টা ওরা সহজেই বাঁচিয়ে নিতে পারল।

এবার প্রদোষ উঠে গেল দশ-বারো ফুট ওপরের সেই ভাল জায়গায়। যেখানে তিনর্জনে নিরাপদে দাঁড়ানো যায়। ওকে বিলে করল বরুণ।

প্রদোষ রক্ ফেসের যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো সেখানে এক ফালি জায়গা ঝুরোমাটি আর কাঁকরপূর্ণ। ভালভাবে বসা যায়। পিছনে ছোটখাট এক ওভারহ্যাং রক্। রক্‌টা যেন ওর মাথার ওপর ঝুলছে। ঝোলা রক্ উচ্চতায় কম হলেও বিস্তার অনেক। ডানদিকে রকের এক অংশ চৌচির হয়ে ফাটা। ফাটা অংশের পরই আর একটা ভার্টিক্যাল ওয়াল। এ তুটোর মধ্যে যে কোণ আছে তা আরোহণের পক্ষে সুবিধাজনক।

বরুণকে বিলে করার আগে প্রদোষ এ্যাঙ্‌কার খুঁজতে লাগল। নিজের নিরাপত্তা না থাকলে সহ-আরোহীদের সাহায্য করা যায় না, আর উচিতও নয়। কারণ বিপদ ঘটলে কেউ বাদ যাবে না।

ওভারহ্যাং পাথরের ঠিক নিচে দেখল একটা বড় পাথরের টুকরো নিচের মাটির সঙ্গে ওভারহ্যাংকে আটকে রেখেছে। অনেকটা চোকষ্টোনের মতো। হাত দিয়ে নেড়ে দেখল দারুণ মজবুত। এক গাছা শ্লিং পাথরের ফাঁক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে তু'মুখ এক করে একটা স্ক্রু ক্যারাবিনার আটকে বিলের দড়ির যে লুপ বানিয়েছিল কোমরের কাছে, তাতে আটকে দিয়ে স্ক্রু গেট বন্ধ করে দিলো। একে থ্রেড বিলে বলে। থ্রেড বিলে ওর কোমরের ওয়েষ্ট ব্যাণ্ডে লাগানো উচিত ছিল, কিন্তু শ্লিং পাথরের গায়ে লাগানোয় খুবই ছোট হয়ে গিয়েছিল। থ্রেড বিলে ক্যারাবিনারের নাগালের বাইরে

থাকায় বিলে দড়ির লুপ লাগাতে হল। এতে নিরাপত্তা ব্যাহত হল না। কারণ বিলের দড়িটাও ওর কোমরে ফিগার-অব-এইট-নট দিয়ে মজবুত করে বাঁধা আছে।

এখন সজলের অর্থাৎ শেষ আরোহীর ওঠার পালা। প্রদোষ বরুণকে হিপ বিলে করছে। কোমরে বরুণের বিলে দড়ি শক্ত করে ধরে রেখেছে। বরুণ আবার সজলকে শোল্ডার বিলে করছে। হিপ বিলে করতে পারত, কিন্তু শোল্ডার বিলেতে আরোহীর সমস্ত ওজন কাঁধ এবং পিঠের ওপর থাকে বলে এই বিলে নিরাপদ। বরুণ সব সময় নিরাপদ ব্যবস্থাই পছন্দ করে।

সজল আরোহণ শুরু করার আগে নিচ থেকে বরুণকে বলল, বিলে করো, উঠছি।

বরুণ প্রদোষকে বলল, লিডার, সজল উঠছে, বিলে ঠিক করো।

—আসতে বল, বিলে ঠিক আছে। প্রদোষ উত্তর দিলো।

বরুণ সজলকে বলল, এবার এসো।

সজল উত্তর দিলো, আসছি।

প্রদোষ এবং বরুণের পথেই আরোহণ শুরু করল সজল। ইনকাট্, সাইড, প্রেসার, গ্রিপ ইত্যাদি যত রকমের হোল্ডস্ আছে সব কিছুর সাহায্যে রানিং বিলের কাছে এসে সজল ক্যারাবিনার থেকে নিজের অংশের দড়িটা খুলে নিল। তারপর পিটন থেকে ক্যারাবিনার খুলে কোমরের শ্লিং-এ রেখে কঠিন জায়গাটা উঠে গেল। ওর তো আর প্রদোষের মতো পড়ার ভয় নেই। কারণ, বরুণ ওকে ওপর থেকে বিলে করছে। প্রদোষ লিডার, তাই ওকে বিনা বিলেতেই উঠতে হয়েছে। ক্যারাবিনার ওপরে লাগতে পারে এ কারণেই ওটি খুলে সঙ্গে নিয়ে বরুণের কাছে আসতেই ওরা দুজন এ্যাঙ্কার বদল করল। বরুণ প্রদোষের কাছে গিয়ে পৌঁছতে প্রদোষ ওর সঙ্গে এ্যাঙ্কার বদল করে ওভারহ্যাং ক্লাইম করার জন্য এগিয়ে গেল।

ওভারহ্যাং আর রক্‌ওয়ালের সংযোগস্থলে যে কোণ আছে সেখান দিয়ে প্রদোষ প্রেসার হোল্ডসের সাহায্যে বেশ সাবলীলভাবে শৈলপ্রাচীরের ওপর উঠে গেল।

এই ভাবে ওরা যখন তিন জনেই কঠিন শৈল প্রাচীরের ওপর উঠে এলো তখন ওদের আনন্দ আর ধরে না। বুকে ওদের অসীম সাহস এসে গেছে। এখন যে কোনো কঠিন শিলায় ওরা অনায়াসে ওঠা নামা করতে পারবে।

আরোহণের চেয়ে অবরোহণ কঠিন। আজ পর্যন্ত যত দুর্ঘটনা ঘটেছে তার নিরানব্বুই ভাগই নামার সময়। একটা সহজ উপমা, মই বেয়ে ওপরে ওঠা যত সহজ ততো সহজ কি মই বেয়ে নেমে আসা? অভ্যাস না থাকলে পা কাঁপে। অনেকেই আবার মই সুদ্ধ আছাড় খায়। তবে অভ্যাস হয়ে হয়ে গেলে আর আছাড় খাবার ভয় থাকে না।

ওই একই পথে ওরা তিনজন নেমে এলো। তবে এবার প্রদোষ শেষে আর সজল সবার আগে। প্রথম যে নামল তার ভয় কম। কারণ তার কোমরে বাঁধা দড়ি অন্যজন ধরে রেখেছে। স্লিপ করলে পড়ার ভয় নেই। দ্বিতীয়জনেরও বিলে করা আছে। কিন্তু শেষজন অর্থাৎ লিডারের কোনো বিলে নেই। তাকে নিজের সামর্থের ওপর আস্থা রেখেই নামতে হবে। যদিও একটা রোপের সবাই লিডার, তবু যে যখন দায়িত্ব নেয় নেতৃত্বের, তাকে তখন বেশি ধকল সহ্য করতে হয়।

শৈলারোহণ যেমন একজনকে সাহসী করে তোলে তেমনই বন্ধু-বৎসল করায় সাহায্য করে। একটা দড়িতে তিনজনের কোনো আলাদা অস্তিত্ব থাকে না। থাকে না স্বার্থপরতা। আজকের দিনে এটার মূল্য কি কম!

দুরুহ রক্ ফেস আরোহণ করে, প্রদোষ বরুণ আর সজল বিশ্রাম নিচ্ছে শুশুনিয়া পাহাড়ের ক্লিফের ওপর বড়সড় জায়গাটায়। ওদের কোমরে বিলে করার নাইলন দড়িটাও লাগানো আছে। ওরা আরোহণের আনন্দে নিজেদের মধ্যে গপ্পসপ্প করছে।

ওই একই পথে উঠে আসছে অন্য ছেলেমেয়েরা। সবাই প্রদোষদের মতোই তিনজন করে এক এক দলে উঠে আসছে। সব শেষ দলটায় এলো শিক্ষার্থী দলের বয়োজ্যেষ্ঠা দিদি। ওনার সঙ্গে এলেন দু'জন শিক্ষক। দিদির যথেষ্ট সাহস থাকলেও বয়েস হয়েছে অন্যদের চেয়ে বেশি। তাই ওঁকে শিক্ষক দু'জন একটা রোপে বেঁধে বিলে করে নিয়ে এসেছেন।

ক্লিফের মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার এলো। দিদিকে দেখে সবাই খুশি। উনি আবার ক্যাম্পে মায়ের ভূমিকা নিয়েছেন। তাই একটু ভালমন্দ খাবার লোভে সবাই ওঁকে তোয়াজ করে।

কিছুটা বিশ্রাম করার পর শিক্ষক এসে দাঁড়ালেন শিক্ষার্থীদের সামনে। বললেন, আরোহণের প্রাথমিক প্রায় সব কিছু তোমাদের শেখানো হয়ে গেছে। এখন শেখানো হবে কি করে চিমনী ক্লাইম করতে হয়।

চিমনী আরোহণ ঃ

শিক্ষক বুঝিয়ে দিলেন চিমনী কি, কোথায় কি অবস্থায় চিমনীতে ওঠার দরকার হয় এবং কেমন করে চিমনীর ভেতর দিয়ে উঠতে হয়।

চিমনী বস্তুটি পাহাড়ের কঠিন শিলার ফাটল। বিরাট পাথরে নানা কারণে বড় বড় ফাটল সৃষ্টি হয়। এই ফাটল কোথাও এক ফিট চওড়া কোথাও চার-পাঁচ ফুট চওড়া। কমবেশিও হতে পারে।

ফাটলের উচ্চতাও নানা রকম হতে পারে। দশ-পনেরো থেকে শ-দু'শ ফুট হওয়াও অসম্ভব নয়। চিমনী নানা রকমের—নব্বুই ডিগ্রির খাড়া হতে পারে আবার তিরিশ-চল্লিশ, ষাট-সত্তর ডিগ্রির ঢাল থাকতে পারে। অর্থাৎ পাথর যেমন ফাটে চিমনীও তেমন হয়। অনেক সময় চিমনীর নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সোজাসুজি হতে পারে। আবার সোজা ফাটল ডানদিক বাঁদিক ঘুরে গিয়ে চিমনীর মাথায় যেতে পারে। সোজাসুজি ফাটলের চেয়ে আকাবাঁকা ফাটলঅলা চিমনীই বেশি দেখা যায়। আসলে পাহাড়টার ফাটার ওপর সব কিছু নির্ভর করে।

সাধারণতঃ দেখা যায় চিমনীর নিচে ফাটল যত চওড়া মাথায় তত সরু হয়ে গেছে। অনেক সময় সেই সরু ফাটল দিয়ে গলে যাওয়া যায় না। চিমনীর মধ্যে এবং মাথার দিকের ফাটলে অনেক সময় পাথর আটকে থাকে। তাকে অর্থাৎ ওই আটকে থাকা পাথরকে বলে চোক ষ্টোন (Chock Stone)। চিমনীর ভেতরে চোক ষ্টোন যেমন আরোহণে অসুবিধের সৃষ্টি করে তেমন অনেক সময় আরোহীকে বিশ্রাম নেবার জন্য সাহায্য করে। তাছাড়া চোকষ্টোনের সঙ্গে শ্লিং লাগিয়ে রানিং বিলে (Running Belay) করার সুবিধে হয়।

শৈলারোহণ করতে গেলে অনেক সময় শৈলশিখরে ওঠার মতো পথ পাওয়া যায় না। তখন যদি কাছাকাছি কোথাও চিমনী থাকে তাহলে শিখরে পৌঁছে যাওয়া সহজ হয়। শুশুনিয়ার ওই শৈলশিখরে পৌঁছতে হলে চিমনী উঠতেই হবে। না হলে অনেকটা ঘুরে মূল শিখরে উঠতে হয়।

শিক্ষকের কাছে শোনার পর সবাই চিমনী দিয়ে শৈলশিখরে ওঠার ইচ্ছাই প্রকাশ করল। শিক্ষক খুশি হয়ে চিমনীর মধ্যে ঢুকে গেলেন।

চিমনীটি তিরিশ-পঁয়তিরিশ ফুট উঁচু, তার মধ্যে বিশ ফুট

ভার্টিক্যাল অর্থাৎ খাড়াই। শেষের দশ-পনেরো ফুট ডান দিকে আড়াআড়ি ভাবে ফাটল। চিমনীর প্রবেশ পথ প্রায় ছ'ফুট চওড়া। ভেতরের দিকে দুই আড়াই ফুট চওড়া। মাঝ বরাবর প্রায় তিন-চার ফুট চওড়া। ওখানের দেওয়াল বেশ মসৃণ। সামনের দেওয়ালে বহু ফাটল আছে। হাত দিয়ে ধরার অর্থাৎ "grip" করারও সুবিধে রয়েছে। তিনি মাঝখান দিয়ে ওঠার পথ ঠিক করলেন।

শৈলারোহণে আরোহীর সুবিধামতো পথ খুঁজে নেবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কারণ, সব শৈলারোহীই তো আর এক রকম কঠিন আরোহণ বা অবরোহণ করতে পারে না। তাই যে যার নিজের সুবিধে মতো পথ খুঁজে নেয়। তবে শিক্ষণকালে প্রথমে সহজপথে অভ্যাস করাই ভাল। সহজ পথে সহজ শিলায় আরোহণ-অবরোহণ অভ্যাস করতে করতে সাহস সঞ্চয় হয়। তারপর কঠিন পথে কঠিন শৈলশিরায় আরোহণ করা সহজ হয়।

শিক্ষক চিমনীর মাঝ বরাবর মসৃণ দেওয়ালটায় পিঠ রেখে বাঁ পা সামনের দেওয়ালে চেপে রাখলেন। এখন ডান পা পিছন দিকে মুড়ে পিঠ-রাখা দেওয়ালে রাখলেন। হাত দুটোও রাখলেন পিছনের দেওয়ালে কোমর বরাবর। অর্থাৎ হাতের চেটো দিয়ে পিছনের দেওয়ালে ভর দিলেন। এবার উনি ওপরের দিকে উঠছেন। দু'হাতে আর ডান পায়ে ভর দিয়ে শরীরটা ঠেলে দিলেন ওপরে। এক বারেই প্রায় এক ফিটের বেশি উঠে গেলেন। এবার ডান পা তুললেন ওপরে অর্থাৎ আগে যেমন পা ভাঁজ করে পিঠ দেওয়ালে রাখা ছিল তেমন। তারপর বাঁ পা তুললেন সামনের দেওয়ালে। দেখা গেল ডান-পা বাঁ-পা, হাত এবং কোমর সমান তালে এক ফিটেরও বেশি ওপরে উঠে গেছে। চিমনীর ফাটলে এভাবে ওঠাকে বলে ব্যাকিং-আপ (backing up)।

এইভাবে এক একটা ঝাঁকুনি দেন আর উঠে যান ওপরে। এবার তাঁকে বাঁক নিতে হবে সামনের দিকে। আর সোজাসুজি ওঠা যাবে

না কারণ, ফাটলটা অর্থাৎ চিমনী থেকে বাইরে বেরুবার মুখ সামনের দিকে প্রায় ষাট ডিগ্রি আড়াআড়ি উঠে গেছে। বাঁক নেবার মুখে সামান্য জায়গা আছে, সাময়িক বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে ওখানে।

এদিকের দেওয়ালে এসে আড়াআড়ি ষাট ডিগ্রির ফাটলে ঢুকলে আর শিক্ষার্থীদের দেখা যাবে না তাই উনি ফাটলে ঢোকার আগে কিছু নির্দেশ দেবেন বলে পিছনের দেওয়ালে পিঠ রেখে পা দুটো সামনের দেওয়ালে চেপে রাখতে ওঁর শরীরটা চোকষ্টোনের মতো ফাটলে আটকে গেল। এটাকে বলে হিউম্যান চোকষ্টোন। এভাবে বড় চিমনীতে বেশ আয়েস করে বিশ্রাম নেওয়া যায়।

শিক্ষককে ওভাবে বসতে দেখে শিক্ষার্থীরা ভাবল উনি বোধহয় আর উঠতে পারছেন না, এবার হুড়হুড় করে গড়িয়ে পড়বেন চিমনীর নিচে। সন্ত্রাসে তারা ওপর দিকে অন্ধকার চিমনীর মধ্যে শিক্ষককে দেখতে লাগল। শিক্ষক কিন্তু মজা পাচ্ছেন। কারণ তিনি আরাম করে বসে আছেন—যেন ইজিচেয়ার।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। শিক্ষক নিচে যেই শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে গেছেন অমনি ওপরের আড়াআড়ি চিমনীর মধ্যে হুটোপাটি পাখা ঝট-পটানী। শিক্ষক চমকে উঠে সামনে তাকাবার আগেই কি একটা বস্তু তাঁর চোখেমুখে ঝাপটা দিল। উনি বিষম ঘাবড়ে গেলেন। এমন সময় নিচে ছুটোছুটি হুটোপাটি। চিমনীর সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পালালো আশেপাশে। শিক্ষকের কানে এলো—চামচিকি···চামচিকি!

বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে, কিন্তু হাসিও পাচ্ছে খুব। কি ভয়টাই না হয়েছিল। এবার ফাটলের মধ্য দিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখেন একটা বড় হনুমান অবাক বিস্ময়ে দেখছে ওঁকে!

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, বিশেষ করে চিমনী ক্লাইম করার আগে চিমনী সাফ করতে হয়। যেমন রক্ ফেস সাফ করে

ওঠার নিয়ম তেমন দেখতে হবে চিমনীতে ওরকম কিছু আছে কি না। না হলে এ ধরনের বিপদ হতে পারে।

চিমনীর ফাটলের মধ্যে নানা রকম জীবজন্তু বাসা করে। অনেক জায়গায় সাপ বাঘ পর্যন্ত বাসা বেঁধে থাকে। সাপ থাকার সম্ভাবনা বেশি। এ ছাড়া থাকে চামচিকি, ভীমরুল আর বোলতার বাসা। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাহাড়ে বড় বড় বোলতা আর ভীমরুলের বাসা দেখা যায়। ক'বছর আগে বোম্বের এক পর্বতারোহণ ক্লাবের শৈলারোহণ শিক্ষাক্রমে বোলতার আক্রমণে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় দু'একজন শিক্ষার্থীর প্রাণও গেছে।

চিমনী আরোহণ করার আগে চিমনীর মুখে শুকনো পাতা এবং কাঠ জ্বেলে ধোঁয়া দেওয়া উচিত। ধোঁয়ায় ভীমরুল বোলতা সাপখোপ যাই থাক সব বেরিয়ে আসবে। তারপর আরোহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিয়ে এবার আড়াআড়ি ষাট ডিগ্রির ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এখানে দু'পাশের পাথর খুবই কাছাকাছি তাই আগের মতো ব্যাকিং আপ অর্থাৎ এক দিকের দেওয়ালে পিঠ রেখে অপর দেওয়ালে পা দিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এখানে শৈলপ্রাচীর আরোহণ করার নিয়মে ফাটল ধরে এবং ফাটলে পা রেখে উঠে এলেন চিমনীর মাথায়। এভাবে আরোহণকে রিগলিং (wriggling) বলে। রিগলিংয়ে হাতের প্রেসার বেশি দিতে হয়। এ প্রথা বেশ শ্রমসাধ্য।

চিমনীর বহির্মুখের ফাটলে আর একটি পাথর আটকে আছে। এটিও চোকস্টোন। চোকস্টোনের পাশে বেরুবার সংকীর্ণ পথ। একটা মানুষ কোনো রকমে সেই ফাঁক দিয়ে বেরুতে পারে। চোকস্টোন ধরে সংকীর্ণ গর্তমুখ দিয়ে উনি উঠে এলেন চিমনীর মাথায়।

খোলা আকাশের নিচে বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিলেন চিমনী দিয়ে শৈল প্রাচীরের ওপরে উঠে আসতে।

শিক্ষার্থীরা রুদ্ধশ্বাসে দেখল কি অদ্ভুত সাবলীল ভঙ্গীতে শিক্ষক চিমনীর কঠিন পথে উঠে গেলেন। ওরা একে একে চিমনীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাকালো ওপর দিকে, আবছা অন্ধকার। তবে বুঝতে পারল চিমনীটা খাড়াই উঠে গিয়ে মাঝ-বরাবর একটা জায়গায় বাঁক নিয়েছে। ওখানে সামান্য একফালি জায়গা, তারপর মনে হচ্ছে যেন একটা অতি সংকীর্ণ গহ্বর মতো রয়েছে। ওখান দিয়েই শিক্ষক ওপরে উঠে গেছেন।

—ওই পথে উঠতে হবে! অনেকের চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন।

সহ-শিক্ষক ভরসা দিয়ে বললেন, ইনস্ট্রাকটর যখন ওখান দিয়ে যেতে পেরেছেন তখন তোমরা সবাই পারবে। আগেভাগে ভয় পেয়ে গেলে চলবে কেন?

সবার চোখে মুখে যখন ভয়ভয় ভাব তখন ওদের অবাক করে বয়োজ্যেষ্ঠা দিদি প্রত্যয়ভরা সুরে বললেন, আমি আগে উঠব।

কো-ইনস্ট্রাকটর দিদির কথায় খুব খুশি হয়ে বললেন, ঠিক আছে উনিই প্রথমে উঠবেন।

কো-ইনস্ট্রাকটর একটা দড়িতে নিজেকে বেঁধে নিলেন এবং দড়ির শেষ প্রান্তে দিদিকে বেঁধে নিতে বললেন। দু'জনেই এগু-ম্যান-নট লাগিয়ে নিলেন।

কো-ইনস্ট্রাকটর চিমনীর সব চেয়ে সরু দিকটায় আরোহণ শুরু করলেন। ওদিকে ব্যাকিং-আপ করে ওঠা যায় না। সরু ফাটলে ওঁর বিরাট দেহটা কোনো রকমে ঢুকে গেছে।

উনি সরু ফাটলে দু'পা সোজা করে বুক পিঠ চেপে রাখেন। হাতের চেটো সামনের রক্ ফেসে রেখে হাতের এবং পায়ের যুগপৎ চাপে পিঠে ভর দিয়ে একটু একটু করে উঠতে থাকেন। একে রিগলিং (wriggling) বলে। এটি খুবই শ্রমসাধ্য আরোহণ তবে ইচ্ছে মতো বিশ্রাম নেওয়া চলে। দিদি ওঁকে হাতের গোটানো

(কয়েল করা) দড়িতে বিলে করছেন। যেমন ভাবে ওঁরা খানিক আগে শৈলপ্রাচীর আরোহণ করার সময় বিলে করেছেন তেমন।

বেশ কিছুটা এইভাবে অর্থাৎ রিগলিং করে ওঠার পর দেখলেন চিমনীটা ওপর দিকে খুব সরু হয়ে গেছে। ওঁর দেহটা আর তার মধ্যে ঢুকছে না, উনি চিমনীর মাঝ-বরাবর চওড়া জায়গাটায় সরে আসা মনস্থ করলেন। চিমনীর দেওয়ালের ফাটল ধরে এবং ফাটলে পা রেখে চিমনীর চওড়া অংশে এগিয়ে এলেন, তারপর শুরু করলেন ব্যাকিং-আপ পদ্ধতিতে আরোহণ। প্রথমে উনি এক দিকের দেওয়ালে পিঠ রাখলেন তারপর সামনের দেওয়ালে একটা পা এবং পিছনের দেওয়ালে আর এক পা রেখে দু'হাতে চাপ দিয়ে চওড়া জায়গাটায় আরোহণ করে যেখানে ফাটল বাঁক নিয়েছে সেখানে এলেন। এখানে সামান্য বিশ্রাম করার জায়গাও আছে। উনি কোনো রকমে বসলেন ওখানে, তারপর দিদিকে নির্দেশ দিলেন আরোহণ করার।

দিদি চিমনীর মাঝবরাবর প্রথমে দেওয়ালের দুদিকে হাত-পা রেখে ফাটল ধরে ব্রিজিং অথবা ষ্ট্যাডলিং পদ্ধতিতে উঠলেন। ওখানে ফাটল চওড়া বলে ব্যাকিং-আপ করলেন না। তারপর সুবিধামত জায়গায় ব্যাকিং-আপ করে উঠতে লাগলেন। কো-ইনস্ট্রাকটর বিলের দড়িটা থাইয়ের ওপর দিয়ে বিলে করছেন। একে থাই বিলে বলে। দেওয়ালে পিঠ লেগে থাকায় হিপ অথবা শোল্ডার বিলে করা সম্ভব নয়, তাই থাই বিলে করতে হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে দড়ি পাথরে ঘসে ক্ষতিগ্রস্ত হবার কোনো আশংকা থাকে না। দিদি অবলীলাক্রমে খাড়াই দেওয়ালের মাথায় পৌঁছে গেলেন। এবার কো-ইনস্ট্রাকটর এগিয়ে যাবেন, না-হলে দিদি তাঁর জায়গাটায় পৌঁছতে পারবেন না। দিদিকে উনি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে এবং সামনের দেওয়ালে দু'পা রেখে হিউম্যান চোকষ্টোন করে বিশ্রাম নিতে বললেন। এতে দিদির পড়ার ভয় নেই, আর বিশ্রাম পাবেন কিছুটা।

কো-ইনস্ট্রাকটর চিমনীর পঞ্চাশ-ষাট ডিগ্রি আড়াআড়ি ফাটলের

মধ্য দিয়ে সাঁতার কাটার মতো অর্থাৎ সুইম করে চিমনীর বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দিদিকে আসতে বললেন। উনি তখন বিলে করছেন, সুতরাং দিদির পড়ার ভয় নেই।

দিদি একই উপায়ে চিমনীর মধ্যে প্রবেশ করলেন বটে, কিন্তু সরু জায়গাটায় হামাগুড়ি দিতে গিয়ে আটকে গেলেন ভেতরে। যতই চেষ্টা করেন ততই আটকা পড়েন। দম বন্ধ হয়ে আসছে। দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, স্যার আটকে গেছি ভিতরে! বেরুতে পারছি না।

ইনস্ট্রাকটর ওপরেই ছিলেন। উনি প্রথমে সাহস দিলেন। তারপর বললেন, আস্তে আস্তে পা পিছনে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিন।

উনি তাই করলেন। কিন্তু ভয় যাবে কেন? উঠতে গেলেই আবার আটকে পড়বেন যে।

ইনস্ট্রাকটর এবার বললেন, দু'পাশের দেওয়ালে সমানভাবে পায়ের চাপ দিয়ে ফাটল ধরে এগোন সামনে। শরীর বেশি ভাঁজ করবেন না যেন, বুক পিঠ ছড়ে যেতে পারে।

দিদি ইনস্ট্রাকটরের কথা মতো সুইম করে সত্যি ওপরে উঠে এলেন। গুমোট চিমনীর গহ্বর থেকে বেরিয়ে বুক ভরে মুক্তির নিঃশ্বাস নিলেন।

দিদিকে কঠিন চিমনীতে উঠতে দেখে আর কারো ভয় হয়নি। এবার ওরা সবাই একে একে উঠে এলো ওপরে। উঠল চিমনীর নানা দিক দিয়ে। কেউ কো-ইনস্ট্রাকটরের সরু ফাটলের মধ্য দিয়ে কেউ মাঝখানের তিন-চার ফুট চওড়া অংশ দিয়ে, আবার বরুণ, প্রদোষ ও সজল উঠল সামনের ৬ ফুট চওড়া দিক দিয়ে ষ্ট্যাডলিং পদ্ধতিতে। ওরা যেন দু'পাশের দেওয়ালে দুটো মই রেখে উঠছে, এমনই সাবলীল আরোহণ।

শুশুনিয়ার চিমনী আরোহণ দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল

আমার নিজের এক অভিজ্ঞতার কথা। যেমন রোমহর্ষক তেমনই মজার ব্যাপার ছিল সে অভিজ্ঞতা।

সেবার দার্জিলিং-এ পর্বতারোহণ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা নেবার জন্য গেছি। আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং দেবার জন্য সিকিম হিমালয়ের রাথং হিমবাহে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পথে আট হাজার ফুট উঁচু গভীর অরণ্য আর শিলাখণ্ড-আকীর্ণ নির্জন বাকিম নামক একস্থানে শিবির স্থাপন হয়েছে। ক্যাম্পের ঠিক পিছনে বিশাল এক হেলানো (slanting) চিমনী, কম করে তিরিশ-চল্লিশ ফুট লম্বা। চল্লিশ-পঞ্চাশ ডিগ্রি হেলানো বিরাট পাথরের স্ল্যাব, নিচের দিকটায় দুটো পাথরের দূরত্ব সাত আট ফুট। অর্থাৎ ওপরে হাত যায় না। কিন্তু ওপরের দিকে দুটো পাথর ক্রমশ প্রায় গায়ে গায়ে ঠেকে আছে। এক দিক সামান্য একটু বেশি ফাঁক তাও মাত্র দেড়-দুই ফুট।

ভিতরে ঢুকতেই গুমোট গরম আর ভ্যাপসা গন্ধ। ওঠার আগেই বুক দুরু দুরু করে উঠল। আমার সঙ্গে রয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত শেরপা ইনস্ট্রাকটর নোয়াং গম্বু। উনি পরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্টে দু'বার আরোহণ করে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। উনি আমায় হেলানো চিমনী আরোহণের কায়দা বুঝিয়ে দিয়ে উঠতে বললেন।

হেলানো চিমনী আরোহণ করতে হলে রক্ স্ল্যাবের ওপর শুয়ে পড়ে ব্যাকিং-আপ করা ছাড়া আর কোনো পদ্ধতিই কাজে লাগে না।

প্রথমেই নিচের পাথরের স্ল্যাবে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি। পাথরের ওপর দিয়ে জল চুঁইয়ে আসছে। তাছাড়া শ্যাওলায় পাথরটি দারুণ পিছল। জায়গায় জায়গায় পাতলা বরফের আবরণ। চিৎ হয়ে শুয়ে ব্যাকিং-আপ করে উঠতে লাগলাম। খানিকটা উঠে বুকের কাছে ওপরের দেওয়াল পেলাম। সুবিধে হল। এবার একটা পা সামনে আর একটা পা পিছনে রেখে হাতে ভর দিয়ে উঠছি ওপরে। ওপর থেকে একটা দড়িতে আমায় বিলে

করছে এক শিক্ষার্থী। নিচে গম্বু উপদেশ দিচ্ছেন কোন দিক দিয়ে উঠব ওপরে।

এক জায়গায় এসে দেখলাম ফাটলের ওপরের পাথরটা একেবারে বুকে ঠেকে গেছে। ভেবে পাচ্ছিনা, কি করে এমন সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়লাম। হাত দিয়ে নিচের পাথরটায় চাপ দিয়ে শরীর ডান দিকে সরাতে চাইলাম, পারলাম না। একমাত্র ডানদিকে যেতে পারলে কিছুটা জায়গা পাওয়া যাবে। একেবারে হিউম্যান চোকষ্টোন হয়ে গেছি যেন। না উঠতে পারছি, না নামতে পারছি, না পাশে সরতে পারছি। এ অবস্থায় কি করণীয় তা আর আমার জানা নেই। ভয় ভয় অনুভূতি আমায় আচ্ছন্ন করছে। ঘাম দিচ্ছে সারা গায়ে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। অসম্ভব হাঁপাচ্ছি। ক্লান্তিতে দেহে কোনো জোর নেই। পিপাসায় গলা কাঠ।

ওপর থেকে প্রথম এভারেষ্ট আরোহী আমাদের কোর্সের ট্রেনিং ডিরেক্টর তেনজিং নোরগে চেঁচিয়ে উঠলেন, ডানদিক দিয়ে জল্‌দি উঠে এসো, ঠারো মত্।

আমার গলায় তখন বাক্ নামক বস্তুটি হারিয়ে গেছে। আমি বাক্‌রুদ্ধ। কিছু একটা বুদ্ধি খাটাবার মতো মানসিকতাও নেই। এই বুকচাপা মৃত্যু গহ্বরেই যে আমার ভবলীলা সাঙ্গ হবে তা বুঝতে পারছি কেবল।

হঠাৎ পাশে দেখলাম গম্বুকে। উনি আমার হাত ধরে ডানদিকে টানছেন। আমি কিন্তু এক ইঞ্চিও নড়তে পারছি না। শেষে শেরপাদের ভাষায় কি যেন বললেন উনি। বুঝলাম ওপর থেকে আর একজন কেউ নেমে আসছে। দেখলাম স্বয়ং তেনজিং নেমে এসেছেন চিমনীর মধ্যে। তারপর ওঁরা দুজনে আমার কোমর ধরে ডানদিকে টেনে নিয়ে গেলেন। এ জায়গাটায় এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আমার চোখে মুখে হিম পরশ বুলিয়ে দিল।

অবসাদে হারিয়ে যাওয়া শক্তি ফিরে পেলাম। পেলাম মনে

জোর। তারপর আর ওঁদের সাহায্য ছাড়াই আমি বাকি পথটা উঠে এসেছি। চিমনীর বাইরে মুক্ত বায়ুতে যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছিলাম।

সে বছর থেকে শুনেছি ওই রাক্ষুসে চিমনীতে শিক্ষার্থীদের ট্রেণিং দেওয়া বন্ধ হয়। এবং চিমনীর মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেন সিকিম সরকার। তেনজিং ও গম্বু বলেছেন, এমন কঠিন আর ভয়াবহ চিমনী তাঁরা খুব কম দেখেছেন।

সিকিমের রাক্ষুসে চিমনী আমার যেমন জীবন সংশয় করতে বসেছিল তেমন আবার মনে সাহস যুগিয়েছিল ভবিষ্যৎ পর্বতারোহণের। শৈলারোহণে যেমন বিভীষিকা আছে, তেমন রোমাঞ্চকর আনন্দের খোরাকও আছে।

ফাটল (crack) আরোহণ

ভার্টিক্যাল রক্ ফেসে অনেক সময় খুব বড় ফাটল পাওয়া যায়। যে ফাটলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করা যায় তা হল চিমনী। চিমনীর কথা আগেই বলেছি। যে ফাটল খুবই সংকীর্ণ তাকে শৈলারোহণের পরিভাষায় বলে ক্র্যাক (crack)।

ক্র্যাক আরোহণ করা খুবই শ্রমসাধ্য এবং আরোহণের কুশলতা থাকা দরকার। ক্র্যাক আরোহণের আগে কিভাবে কোন পথে আরোহণ করা উচিত তা আগে ভাগেই ঠিক করে নিতে হয়। কারণ আরোহণ শুরু করে শরীরের সামর্থ শেষ হবার পূর্বেই ক্র্যাকের মাথায় পৌছতে হবে। না হলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। কুশলী শৈলারোহী হলেই তবে ক্র্যাক আরোহণের চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য শিক্ষার্থীরা ছোটখাট উচ্চতার ক্র্যাক আরোহণ করতে করতেই কুশলী হয়ে ওঠে, আর তখন বড়সড় ক্র্যাক আরোহণ বেশ মজাদার লাগে তাদের কাছে।

ক্র্যাক আরোহণ করতে হলে ফাটলের বাইরের হোল্ডস্ ধরে অথবা হাত এবং পা ফাটলের মধ্যে আটকে অর্থাৎ জ্যাম (jam) করে উঠতে

হবে। ফাটলের বাইরের দিক যদি খুব মসৃণ হয় অথবা রক্ ফেস যদি দেওয়ালের মতো খাড়া হয়, তাহলে হাত এবং পা জ্যাম করতেই হবে। কোনো ফাটল যদি খুবই সূক্ষ্ম হয় যার মধ্যে হাত পা প্রবেশ করিয়ে জ্যাম করা যায় না সে ক্ষেত্রে লে-ব্যাক (layback) করে আরোহণ করতে হয়। সূক্ষ্ম ফাটলের ধারালো অংশ দু'হাত দিয়ে ধরে পা দুটিকে হাতের কাছাকাছি নিয়ে উঠতে হয়। লে-ব্যাক প্রথায় দেহ অনেকটা বাইরে ঝুলে থাকে এবং দেহের সব ভার দু'হাত এবং পায়ের ওপর এসে পড়ে। হাত এবং পা কাছাকাছি না থাকলে পা পিছলে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

লে-ব্যাক প্রথায় আরোহণ করার সময় পা রাখার মতো ভাল ফুট হোল্ডস্ খুঁজে নিতে হয়। যে কোনো সূক্ষ্ম ফাটলেও দু দশ ফুটের মধ্যে পা রাখার জায়গা পাওয়া যায়। কঠিন লে-ব্যাক করতে করতে ফুট হোল্ডস্ পেলে সেখানে সাময়িক বিশ্রাম নেওয়া যায়। জ্যাম এবং লে-ব্যাক প্রথায় অতি কঠিন ক্র্যাক কুশলী শৈলারোহী চমৎকার ভাবে আরোহণ করতে পারে।

গালি (gully) আরোহণ

চিমনীর চেয়েও চওড়া দুটি শৈলপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশকে গালি (gully) বলে। গালি দিয়ে সাধারণত জল, পাথর ও তুষার নেমে আসে। গালি যেন পাহাড়ের নর্দমা। গালিতে যে পাথরখণ্ড থাকে তা খুবই আলগা এবং নড়বড়ে। অনেক সময় পাথরগুলো গালির খাড়াই গায়ে ঝুলে থাকে। সামান্য ছোঁয়া লাগলে গড়িয়ে পড়তে পারে। অনেক সময় ঝোড়ো হাওয়ায়ও পাথরখণ্ড গালি দিয়ে গড়িয়ে আসে।

গালির পথে শৈলশিখর আরোহণ খুবই সুবিধাজনক। অবশ্য বিপদ আছে এ পথে। আরোহীর পায়ে লেগে অথবা দড়িতে জড়িয়ে

আলগা পাথর গড়িয়ে পড়তে পারে। তাতে আরোহীর তো বটেই, বিশেষ করে সেই আরোহীদলের যারা নিচে থাকে তাদের ক্ষতি করতে পারে। তাই গালি আরোহণ করার সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যাতে পাথর না গড়িয়ে পড়ে সেদিকে নজর রাখতে হয়।

সবদিক বাঁচিয়ে সাবধানে গালি আরোহণ করে শৈলশিখরে পৌঁছনো খুবই রোমাঞ্চকর।

ব্যাকিং আপ
পদ্ধতিতে চিমনী
আরোহণ

ব্রিজিং করে
চিমনী আরোহণ

হিউম্যান চোক্‌স্টোন
চিমনীর মধ্যে বিশ্রাম

হাত ও পা জ্যাম্‌
করে চিমনী বা ক্র্যাক্‌
আরোহণ

হাত ও পা জ্যাম্‌
করে ভার্টিক্যাল
ক্র্যাক্‌ আরোহণ

লে ব্যাক প্রথায়
ক্র্যাক্‌ আরোহণ

হিপ বিলে। দ্বিতীয় আরোহীকে
বিলে করার পদ্ধতি

লিডারকে বিলে করার
প্রকৃষ্ট পদ্ধতি

শোল্ডার র‍্যাপেলিং-এর
সাহায্যে দ্রুত অবরোহণ

স্লিং র‍্যাপেলিং-এর সাহায্যে
দ্রুত অবরোহণ

॥ দশ ॥

দ্রুত অবরোহণ (Abseil)

শুশুনিয়া পাহাড়ের কঠিন চিমনী বেয়ে শিক্ষার্থীরা একে একে সবাই শীর্ষে পৌঁছে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে। ওরা চিমনীর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার আলোচনায় মশগুল।

শুশুনিয়ার শৈলশিখর থেকে নেমে আসার অনেকগুলি পথ আছে। ওপথে গ্রাম্য রাখালবালক গরু-ছাগল চরানোর জন্য ওঠানামা করে। সাঁওতালী মেয়েরা আসে শুকনো ডালপালা আর কাঠের বোঝা নিয়ে। শিক্ষার্থীরা কিন্তু ওপথে ফিরবে না। ওরা শৈলারোহণের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর পদ্ধতি এ্যাবসেলিং (abseiling) করে নামবে। আজকের শিক্ষাক্রমে সে রকম ব্যবস্থাই রয়েছে।

শৈলশিখরের যে দিকে ভার্টিক্যাল রক্ ফেস বা খাড়াই পাথুরে দেওয়াল রয়েছে তার মাথায় মোটা মোটা অশ্বত্থের গাছ আর সুন্দর পাথরের এ্যাঙ্কার আছে। ওগুলো এ্যাবসেলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এ্যাবসেল অর্থাৎ দড়ির সাহায্যে দ্রুতগতিতে নেমে আসা। কঠিন রক্ ফেসে থ্রি-পয়েন্ট ক্লাইমিং পদ্ধতিতে হাত ও পায়ের সাহায্যে ফাটল ধরে নেমে আসা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু দড়ির সাহায্যে র‍্যাপেলিং অথবা এ্যাবসেলিং করে নামার মধ্যে যেমন দ্রুতগতি আছে তেমন আছে রোমাঞ্চ।

একশ' ফুট ভার্টিক্যাল রক্ ফেস আরোহণ করতে যদি আধ ঘণ্টা সময় লাগে, তা নামতে লাগবে আরো এক ঘণ্টা। কিন্তু এ্যাবসেল করে নামতে লাগবে মোটে দু'তিন মিনিট। তাই এ্যাবসেল করার সুযোগ থাকলে অবরোহণের কষ্ট কোনো শৈলারোহীই করতে চায় না। অকারণে শরীরের শক্তি-সামর্থ ক্ষয় করার কোনো যুক্তিও নেই।

এ্যাবসেলিং করে নামার অনেক সুবিধা। বিশেষ করে কোনো কঠিন শৈলপ্রাচীর আরোহণ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে তখন আর নামার সময় থাকে না। অন্ধকারে কঠিন আরোহণ কিংবা অবরোহণ প্রাণান্তকর বিপদ ঘটিয়ে দিতে পারে। শৈলারোহণের সময় যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহলে রক্ ফেসের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ভেজা শিলাখণ্ডে হাত-পা পিছলে যায় সহজেই। তখন আরোহণ অবরোহণ উভয়ই এক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই অবস্থায় তাড়াতাড়ি শৈলপ্রাচীর থেকে নেমে আসতে হলে এ্যাবসেলিং করতেই হবে।

উদ্ধারকারীদলকে এ্যাবসেল করতে হয় প্রতি মুহূর্তে। কঠিন শৈলপ্রাচীর থেকে আহত অথবা অসুস্থ আরোহীকে নিচে নামাতে হলে দড়ির সাহায্যে এ্যাবসেল করে নামাতে হয়।

পরিশেষে এ্যাবসেলিং-এর দড়ির ওপর ভরসা করে শূন্যে ঝুলে থাকার ভয়াবহ মানসিকতা যে কোনো শৈলারোহীকে সাহসী করে তোলে। এক কথায় আরোহীর আত্মপ্রত্যয় বাড়ায় এতে।

এ্যাবসেল করার জন্য শৈলারোহীর প্রয়োজন: দুটি নাইলনের কেব্‌লড রোপ, যার দৈর্ঘ্য ১২০ ফুট এবং পরিধি $\frac{7}{8}$ ইঞ্চি। এই দড়ির ভারবহন ক্ষমতা ২০০০ পাউণ্ড, সম্প্রসারণ ক্ষমতা শতকরা চল্লিশ ভাগ এবং ওজন মাত্র আড়াই পাউণ্ড।

কেব্‌লড রোপের বদলে ৯ মিলিমিটার মাপের ক্যারন্‌ম্যান্‌টেল নাইলন রোপ ব্যবহার করা যায়। এ দড়ির দৈর্ঘ্য ১২০ ফুট, পরিধি ১ ইঞ্চি এবং ভারবহন ক্ষমতা ৩৫৫০ পাউণ্ড। এর সম্প্রসারণ ক্ষমতা শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ এবং ওজন তিন পাউণ্ড।

অন্তত একজোড়া ভাল নাইলনের $\frac{7}{8}$ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত স্লিং দরকার। ভাল স্লিং ম্যানিলা-আঁশের তৈরি দড়ি দিয়েও হতে পারে। এ ছাড়া দরকার রক্ পিটন, হাতুড়ি, এক জোড়া চামড়ার দস্তানা এবং পুরো ওজনের হেভি স্ক্রু ক্যারাবিনার। এ ছাড়া বিলে করার দড়িতো সব আরোহীরই সঙ্গে থাকে।

শৈলপ্রাচীরের মাথায়, যেখান থেকে এ্যাবসেল করা হবে, সেখানে দাঁড়াবার মতো বেশ কিছুটা জায়গা থাকা দরকার। তারপর দেখতে হবে এ্যাবসেলিং রোপ এ্যাঙ্কার করার মতো কোনো মোটা এবং শক্ত গাছ আছে কি না। গাছ থাকলে খুবই ভাল। না থাকলে দেখতে হবে কোনো এ্যাঙ্কার করার মতো পাথরের খোঁচ আশেপাশে আছে কি-না। থাকাই স্বাভাবিক। না থাকলে খোঁজ করতে হবে পাথরের স্ল্যাব।

এ্যাবসেলিং রোপ এ্যাঙ্কার করার সময় সর্বপ্রথম পরীক্ষা করে দেখতে হবে, গাছ অথবা পাথরের খোঁচ অথবা মাঝারী বোলডার কিংবা ছোট পাথরখণ্ড যার সাহায্যে এ্যাবসেল করতে হবে তা অবরোহীর দেহের ভার সহ্য করার ক্ষমতা রাখে কি না। অবরোহণের পর এ্যাবসেল দড়ি খুলে নেবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কোথাও জ্যাম অর্থাৎ আটকে যাবার আশংকা আছে কি না। দড়ি জ্যাম হবার আশংকা থাকলে শ্লিংয়ের ব্যবহার করতে হবে। শ্লিং দিয়ে এ্যাঙ্কার করে তার মধ্য দিয়ে এ্যাবসেল দড়ি গলিয়ে নিলে অবরোহণের পর নিচ থেকে তা টেনে বার করা যায়। দু'এক গাছা শ্লিংয়ের চেয়ে একটা দড়ির মূল্য অনেক।

অনেক সময় এ্যাঙ্কার করার মতো গাছ, পাথর অথবা স্পাইক পাওয়া যায় না। সে অবস্থায় শিলাখণ্ডের আড়াআড়ি ফাটলে (horizontal crack) পিটন লাগিয়ে ভাল এ্যাঙ্কার বানানো যায়। সিধা ফাটলে (vertical crack) এ্যাঙ্কার মজবুত হয় না বলে ব্যবহার করা উচিত নয়। আরোহীর দেহের ভারে ফাটল থেকে পিটন খুলে আসতে পারে।

এ্যাঙ্কার করার সময় তা উঁচুতে লাগানো ভাল। এতে নামার সুবিধে হয়। অন্তত কোমরের সমান উচ্চতায় এ্যাঙ্কার করতে পারলে ভাল হয়।

এ্যাঙ্কার যদি খুব ধারালো হয় (স্পাইকের ধার সাধারণত

খুবই পাতলা) তাহলে রুমাল অথবা কাপড় দিয়ে এ্যাঙ্‌কারের ধারালো অংশের স্লিং অথবা দড়িকে জড়িয়ে নিলে কোনো ক্ষতি হবে না। অন্যথায় দড়ি কিংবা স্লিং কেটে যেতে পারে।

এ্যাবসেল করার আগে গাছের গুঁড়ি অথবা এ্যাঙ্‌কার কিংবা পাথরের স্ল্যাবে দু'ভাঁজ করা দড়ির মাঝখানটা বাঁধতে হবে শক্ত করে। এখানে স্পাইক বিলে নট্ লাগিয়ে নিতে হবে ডবল করা দড়িতে। ১২০ ফুট এ্যাবসেল দড়ি দু'ভাঁজ করে যদি আকাঙ্খিত দূরত্বে না পৌছনো যায় তাহলে সে অবস্থায় দুটো ১২০ ফুটের দড়ি ডবল করে নিলে চলে। একদিকে ফিসারম্যান নট্ লাগিয়ে গাছের গুঁড়িতে অথবা পাথরে বেঁধে ডবল রোপ র‍্যাপেলিং করা যাবে।

রক্ ফেসের মাথায় ডবল রোপ বাঁধা হয়ে গেলে দড়ির শেষ প্রান্ত থেকে কয়েল করে নিয়ে রক্ ফেসের গা বাঁচিয়ে নিচে ছুঁড়ে দিতে হবে, যাতে দড়ি পাথরের গায়ে ঘষা না খায় বা আটকে না যায়। এ্যাবসেলিং-এর পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

এবার আরোহীরা সুউচ্চ রক্ ফেসের শিখর থেকে অবলীলায় দ্রুত নেমে আসতে পারে। নামার অনেকগুলো স্টাইল আছে। যেমন, শোল্ডার র‍্যাপেলিং, স্লিং র‍্যাপেলিং, স্টম্যাক্ র‍্যাপেলিং এবং সাইড র‍্যাপেলিং। এক একটা স্টাইলের এক এক রকম কার্যকারিতাও আছে। এদের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন।

শোল্ডার র‍্যাপেলিং—এ্যাবসেলিংয়ের দড়ি যেদিকে এ্যাঙ্‌কার করা আছে সেদিকে মুখ রেখে দু'গাছা দড়িকে দু'পায়ের নিচ দিয়ে সামনে নিয়ে ডান থাই-এর ওপর দিয়ে বাঁ কাঁধে বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে নিয়ে যেতে হবে। তারপর দড়ি বাঁ কাঁধ থেকে পিঠের ওপর আড়াআড়ি এসে ডান কোমরের কাছে ডান হাত দিয়ে ধরতে হবে। বাঁ হাত দিয়ে এ্যাঙ্‌কারের দড়ি ধরে নামার প্রক্রিয়াকে শোল্ডার র‍্যাপেলিং বলে।

এই পদ্ধতি যদিও বহু পুরনো এবং কষ্টকর, কিন্তু এতে আরোহী

শুধু ডবল রোপ আর চামড়ার দস্তানার সাহায্যেই কঠিন পথে নেমে আসতে পারে। যখন স্লিং এবং ক্যারাবিনার সঙ্গে থাকে না তখন এই উপায় অবলম্বন করতে হয়।

শোল্ডার র‍্যাপেলিং করার সময় দু'হাতে ধরা দড়ি যাতে কাঁধ এবং থাই থেকে খুলে না আসে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। শরীর অনেকটা ঝুঁকিয়ে দিতে হবে যাতে রক্ ফেস স্পষ্ট দেখা যায়। এ্যাঙ্কারের দড়ির বদলে কাঁধের ওপর দিয়ে রাখা দড়ি-ধরা হাতের ওপরে দেহের ভার রাখতে হবে। অবতরণের সময় খুব দ্রুত অথবা খুব আস্তে নামা ঠিক নয়। অবতরণ ছন্দবদ্ধ হওয়া উচিত। ওভার-হ্যাং থাকলে সেখানে দ্রুত নেমে যেতে হয়, যাতে রক্ ফেসে মাথা বা দেহের কোনো অংশে আঘাত না লাগে।

স্লিং র‍্যাপেলিং—স্লিং এবং ক্যারাবিনারের সাহায্য নিয়ে অবরোহণ। একটা স্লিংকে বাংলা সংখ্যা চারের আকারে অথবা ইংরেজি 'ফিগার অব এইট' করে নিয়ে দু'দিকে দু'পায়ের নিচে দিয়ে গলিয়ে থাইয়ের ওপর তুলে নিতে হয়। চারের সংখ্যার যেখানে দড়ি আড়াআড়ি মিলিত হয়েছে সেখানটা থাইয়ের ওপর তুলে নিয়ে স্ক্রু করা ক্যারা-বিনারের গেট খুলে স্লিং এবং র‍্যাপেলিং রোপ প্রবেশ করাতে হবে। তারপর র‍্যাপেলিং রোপ ক্যারাবিনারের 'D' অংশে দু'বার পাক দিয়ে গেট বন্ধ করে স্ক্রু আটকে নিতে হবে। তারপর দড়ি ধরে নিচে নামতে হবে। এই পদ্ধতি যেমন আরামদায়ক তেমনই মজার। এ অবস্থায় পিঠে প্রচুর মালপত্র নামানো যায় ওপর থেকে। ভার্টিক্যাল রক্ ফেস থেকে দ্রুত অবতরণ করার জন্য স্লিং র‍্যাপেলিং বিশেষ উপযোগী।

স্টম্যাক্ র‍্যাপেলিং—ডবল রোপের অর্থাৎ এক জোড়া দড়ির একটা দড়ি কোমরের ডান দিকে এবং অপর দড়ি বাঁ দিকে নিয়ে তলপেটের কাছে ডান হাতের দড়ি বাঁ হাতে এবং বাঁ হাতের দড়ি ডান হাতে ঘুরিয়ে নিলে চওড়া বেল্টের মতো হয়ে যায়। এবার দু'হাতে কোমরের

কাছে পাক খাওয়া দুটো দড়ি শক্ত করে ধরে রক্ ফেসের বিপরীত দিকে মুখ করে অন্তত পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট ডিগ্রি শরীরকে সামনের দিকে হেলিয়ে সুন্দরভাবে নেমে আসা যায়। মাউন্টেন রেসকিউ অর্থাৎ পাহাড়ের দুর্গম স্থান থেকে উদ্ধারকার্যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

সাইড র‍্যাপেলিং—ডবল দড়িকে কোমরের ওপর রেখে কোমরের দু'পাশে দু'হাত দিয়ে এ্যাবসেলিং দড়িকে শক্ত করে ধরে নামা। এতেও কেবল চামড়ার দস্তানা লাগে। এ পদ্ধতি খুব কমই ব্যবহার করা হয়। রক্ ফেস কঠিন হলে সাইড র‍্যাপেলিং অচল।

এ্যাবসেল করে নিচে নামার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বিলে করা হয়। বিলের নাইলন দড়ি অবরোহণকারীর কোমরে এণ্ড-ম্যান নট্ লাগিয়ে বেঁধে দিয়ে বিলে করলে হঠাৎ পড়ে যাবার ভয় থাকে না। আরোহণের সময় যেমন বিলে রক্ষাকবচ, অবরোহণ করার সময় সেই একই রক্ষাকবচ ব্যবহার করা দরকার। বিশেষ করে নতুন শিক্ষার্থীর সাহস এনে দেবার জন্য বিলে করা উচিত।

এ্যাবসেল করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অবরোহণকারী (বিশেষ করে নতুন শিক্ষার্থীরা) সাধারণত খুবই ভীত হয়ে পড়ে। ভয় হয়, যদি হাতে ধরা দড়ি পিছলে যায় অথবা ঠিক মতো ব্যালান্স রাখতে না পারে তাহলে মহাশূন্য থেকে আছড়ে নিচে পড়তে হবে। রুক্ষ শিলার বুকে আছাড় খেলে মৃত্যু অবধারিত।

শিক্ষার্থীদের ভয় অমূলক নয়। অসাবধান হলে অথবা সাহস হারিয়ে ফেললে নিচে আছড়ে পড়ার ভয় অবশ্যই আছে। কিন্তু যদি বিলে থাকে তাহলে বিপদ এড়ানো যেতে পারে সহজেই এবং নতুন শিক্ষার্থীর মনোবল বেড়ে যায়।

এ্যাবসেল করার আগে সর্বপ্রথম র‍্যাপেলিং রোপ টিম্বার হিচ নট্ লাগিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হয় দড়ি অটুট আছে কি না দেখার জন্য। তাছাড়া শ্লিং আর ক্যারাবিনারও পরীক্ষা করে নিতে হয়। এ্যাবসেলের

সাজসরঞ্জাম কখনোই খুব পুরনো হওয়া উচিত না। বিশেষ করে শ্লিং নতুন এবং মজবুত হওয়া দরকার।

এ্যাবসেলিংয়ে উত্তেজনা থাকলেও এবং নতুন শিক্ষার্থী এ্যাবসেলিংয়ে সবচেয়ে আনন্দ পেলেও—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শৈলারোহণের সময় এই এ্যাবসেলিং করতে গিয়ে বহু শিক্ষার্থী এবং পাকা শৈলারোহীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। যত মৃত্যু ঘটেছে তার হিসেব করলে দেখা যাবে যথাযথ পরীক্ষা না করে র‍্যাপেলিং দড়ি ব্যবহার করায় দড়ি ছিঁড়ে অথবা শ্লিং ছিঁড়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে বেশি। তাছাড়া স্পাইক (পাহাড়ের গায়ে সরু পাথরের খোঁচ) উপড়ে এবং ক্যারাবিনার ভেঙেও অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

শৈলারোহী হতে হলে মানসিক প্রস্তুতি এবং ধীরস্থির হতে হবে আগে। এ দুটি গুণ আয়ত্ত হলে তবেই শৈলারোহণের রোমাঞ্চ উপভোগ করা যাবে।

শুশুনিয়ার শৈলশিখরের ওপর চিমনীর আশেপাশে অনেকগুলি শিলাখণ্ড—রক্ ফেস আছে। এর মধ্যে যে রক্ ফেসটি ষাট ডিগ্রি কোণাকুণি হেলে দাঁড়িয়ে আছে তার উচ্চতা হবে অন্তত পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট! ওখানেই দ্রুত অবতরণ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হল।

ইনস্ট্রাকটররা এ্যাবসেলিংয়ের চারটে ষ্টাইলই দেখিয়ে দিলেন। এই চারটে ষ্টাইল—শোল্ডার র‍্যাপেলিং, শ্লিং র‍্যাপেলিং, স্টম্যাক্ র‍্যাপেলিং এবং সাইড র‍্যাপেলিং। নামার সময় রক্ ফেসের কতটা বাইরে শরীর কতটুকু হেলে থাকবে, দু'পায়ের মধ্যে এক থেকে দেড় ফুট ফাঁক থাকবে, হাঁটু ভাঙবে না এবং কতটা তাড়াতাড়ি নামলে শরীরের ভারসাম্য ঠিক থাকবে ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে দিলেন শিক্ষার্থীদের কাছে।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রোপে এ্যাবসেল করে নিচে নামতে বললেন ইনস্ট্রাকটর। তিনটি করে ছেলে-মেয়েদের তিনটি রোপের অবতরণের আলোচনা করব।

প্রথম ও দ্বিতীয় দলের সবাই ছেলে এবং তৃতীয় দলে সবাই মেয়ে। প্রথম দল শোল্ডার র‍্যাপেলিং করবে, দ্বিতীয় দল করবে স্টম্যাক্ র‍্যাপেলিং এবং তৃতীয় অর্থাৎ মেয়েদের দল করবে স্লিং র‍্যাপেলিং। এই তিনটি দলকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে ওদের আরোহণ-অবরোহণের সাবলীলতা বিচার করে। ওদের দেখে বাকি শিক্ষার্থীরা এ্যাবসেলিং অভ্যাস করবে।

তিনটি দলই মোটা একটা গাছে এবং বড় পাথরে এ্যাবসেলিং রোপ টিম্বার হিচ নট্ লাগিয়ে টেনে পরীক্ষা করল। দেখল দড়ি অটুট আছে। ১২০ ফুটের নাইলন দড়িটার ভারবহনের ক্ষমতা ২০০০ পাউণ্ড। ডবল করে নিলে হবে মোট ৪০০০ পাউণ্ড। সম্প্রসারণ ক্ষমতা শতকরা চল্লিশ ভাগ। এটি কেবল্‌ড রোপ। ক্যারন্‌ম্যান্‌টেল রোপ পেয়েছে মেয়েরা।

প্রথম দলের তিনটি ছেলে এ্যাবসেলিং রোপ দু'ভাঁজ করে নিয়ে মোটা গাছের গায়ে স্পাইক বিলে নট্ লাগিয়ে নিলো। তারপর দড়ির শেষপ্রান্ত থেকে দু'হাতের সমান দূরত্ব নিয়ে কয়েল করে রক্ ফেসের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলো নিচে। দড়ি নিচে ফেলার সময় ওরা সাবধান হল, যাতে দড়ি মাঝপথে কোনো ওভারহ্যাং অথবা স্পাইকে আটকে অথবা জড়িয়ে না যায়। দড়ি ঠিক মতো মাটি স্পর্শ করলেই তবে অবরোহণ শুরু হবে। না হলে দড়ি গুটিয়ে নিয়ে আবার নিচে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। ওদের দড়ি ঠিক মতোই মাটি স্পর্শ করেছে।

প্রথমে দলের দ্বিতীয় সদস্যকে নামবার সুযোগ দিলো। অবরোহী শোল্ডার র‍্যাপেলিং করার জন্য গাছের সামনে দাঁড়িয়ে দু'গাছা র‍্যাপেলিং রোপ দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে নিয়ে বাঁ পায়ের থাইয়ের পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে নিলো। তারপর দড়ি আড়াআড়ি বুকের ওপর দিয়ে ডান কাঁধ বেড় দিয়ে বাঁদিকের কোমরে বাঁ হাতে ধরল। ডান হাত দিয়ে গাছ থেকে আসা দড়ির দিকটা শক্তভাবে ধরে রক্ ফেসে দাঁড়াল। শোল্ডার র‍্যাপেলিং করার সময় যার যেমন সুবিধা অর্থাৎ দড়ি ডান

অথবা বাঁ কাঁধ ঘুরিয়ে ডান অথবা বাঁ হাতে ধরতে পারে। এবার ওর হাতে দুটো র‍্যাপেলিং করার চামড়ার দস্তানা পরিয়ে দিলো দলের নেতা। তৃতীয় সদস্য ইতিমধ্যে অবরোহীর কোমরে বিলে করার দড়ি বেঁধে দিলো।

অবরোহী সাবধানে পিছনে-সামনে দেখে ষাট ডিগ্রি খাড়া শৈল-প্রাচীরের সুবিধামতো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। এবার মহাশূন্যে ঝাঁপ দেবার মতো মানসিকতা ওর। যদিও ভয়ের কিছু নেই—বিলে আছে বন্ধুর হাতে। ডান এবং বাঁ-হাতের দড়িটা শক্ত করে ধরে শিলাগাত্রে পা দিয়ে ধাক্কা লাগিয়ে নিচে নামা শুরু করল। গতির সঙ্গে তাল রেখে দু'হাতে শক্ত করে ধরা দড়ি ছাড়তে ছাড়তে নেমে এলো নিচে। মাটিতে পা দিয়ে অবরোহী বলল, বিলে লুজ করো।

ওপর থেকে বিলে আলগা করে দেওয়া হলে অবরোহী নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে কোমরের বিলে রোপ খুলে দিলো। তৃতীয় আরোহী ওপর থেকে বিলের দড়ি কয়েল করে নিয়ে নিজের কোমরে বাঁধল। কারণ এবার, ওর নামার পালা।

তৃতীয় আরোহী একইভাবে শোল্ডার র‍্যাপেলিং করে নেমে এলো। ওকে বিলে করল দলের নেতা অর্থাৎ শেষ আরোহী।

নেতাকে এবার নামতে হবে বিলে ছাড়া। কারণ ওদের দলের তিনজনের দু'জন ইতিমধ্যে নেমে গেছে।

দলনেতা প্রথমেই বিলের দড়িটা কয়েল করে নিচে ফেলে দিলো। তারপর দেখল কোনো সাজ-সরঞ্জাম ওপরে পড়ে আছে কি না। এবার র‍্যাপেলিং-এর দড়ি মোটা গাছ থেকে খুলে নিলো। কোনো নট না লাগিয়েই ওকে নিচে নেমে আসতে হবে দড়িটা বাঁচাবার জন্য।

নাইলনের দড়িটাকে গাছের গুঁড়িতে একটা পাক দিয়ে দু' ধারের দড়ি শোল্ডার র‍্যাপেলিং-এর মতো শরীরে জড়িয়ে নিলো। হাতে দস্তানা পরে দলনেতা এবার আগের আরোহীদের মতোই সাবলীলভাবে নেমে এলো সঙ্গীদের কাছে। তারপর দড়ির এক প্রান্ত ধরে টেনে র‍্যাপেলিং

রোপ খুলে ফেলল। আরোহণের কোনো সাজ-সরঞ্জাম না ফেলেই শৈলারোহী-দল নিচে নেমে আসতে পারে সহজে।

মেয়েদের দলটি সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দ্রুত অবতরণ অর্থাৎ শ্লিং র‍্যাপেলিং করে শৈলচূড়া থেকে নামবে।

দলনেত্রী দেখল অপর দু'দল ছেলে গাছ এবং পাথরের স্ল্যাব ব্যবহার করেছে। ওরা এখন ও-দুটো এ্যাঙ্কারের বদলে নতুন এ্যাঙ্কার করতে পারে এমন ভাল স্পাইক দেখতে পেল না। তখন ঠিক করল পিটন লাগিয়ে এ্যাঙ্কার করবে।

একটি শিলাখণ্ডের আড়াআড়ি ফাটলের মধ্যে পিটন রেখে হাতুড়ি দিয়ে সমস্ত ব্লেডটা ফাটলে ঢুকিয়ে দিল। কেবল পিটনের মাথা এবং চোখ বাইরে বেরিয়ে থাকল। ১২০ ফুটের এ্যাবসেলিং রোপ দু'ভাঁজ করে নিয়ে দেখল যেখানে ওরা নামতে চাইছে সেখানে ওই দড়ি পৌঁছবে না। ওরা সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ক্যারন্‌ম্যান্‌টেল দড়ি নিয়ে ফিসারম্যান নট্‌ লাগিয়ে পিটনের চোখের মধ্য দিয়ে দড়িটা গলিয়ে কয়েল করে নিচে ফেলে দিলো। ওরা এখন মোট ১২০ ফুট নিচে নামতে পাবে।

মেয়েদের রোপের দ্বিতীয় মেয়েটিকে আগে নামার সুযোগ দিলো। তৃতীয় মেয়েটি অববোহিণীর কোমরে বিলের দড়ি লাগিয়ে প্রস্তুত হল। অবরোহিণী একটা শ্লিংকে দু'ভাঁজ কবে ফিগাব-অব-এইট বানিয়ে দু'পায়ের মধ্যে গলিয়ে থাইয়ের ওপরে টেনে আনল। তারপব যেখানে শ্লিংয়ের ফিগার-অব-এইট তৈরি হয়েছে সেখানে স্ক্রু ক্যারাবিনারের গেট খুলে আটকে নিলো। এবার এ্যাবসেল এ্যাঙ্কারের দিকে মুখ রেখে এ্যাবসেলিং রোপ তুলে ক্যারাবিনারের গেট ওপর দিকে রেখে দড়ি ঢুকিয়ে দুটো পাক দিয়ে নিলো ক্যারাবিনারের মধ্যে। এ্যাঙ্কারের দিকের দড়ি বাঁ (অথবা ডান) হাতে ধরে, দড়ির যেদিক নিচে ঝুলছে তা ডান (অথবা বাঁ) হাতের শক্ত মুঠোয় ধরে নামার জন্য প্রস্তুত হল। মেয়েটির পা দুটো প্রায়

এক-দেড় ফুট খোলা। শরীর পিছন দিকে হেলিয়ে যে পথে নামবে তা লক্ষ্য করে অবতরণ শুরু করল। প্রথমটা ধীরে ধীরে আসার পর ওর দেহের ভার আপনি ক্যারাবিনারের মধ্যে পাক খাওয়া শুরু করতে বুঝল এবার গতি বাড়ানো যেতে পারে। গতি বাড়ানো কমানো ওর ছু'হাতের মুঠোয়।

দড়ি আলগা করতেই গতি বাড়ল খুব। একটা ওভারহ্যাং-এর কাছে এসে ছু'পা জুড়ে লাফ দিলো আর সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে মেয়েটি যেন ভাসতে ভাসতে নামতে লাগল। ও খুবই সাবধান ছিল, তাই ওভারহ্যাং পার হবার সময় রক্ ফেসে আঘাত না খেয়েই সাবলীলভাবে নিচে নেমে এলো। ওর কোমরে বিলে থাকায় সাহস খুবই বেড়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় মেয়েটি নেমে আসার পর তৃতীয় মেয়েটি একইভাবে অবতরণ করল। তারপর নেমে এলো দলনেত্রী। নিচে এসে এ্যাবসেলিং .রোপ পিটনের মধ্য থেকে খুলে নিলো। ওদের কেবল পিটনটাই খোয়া গেল।

ইনস্ট্রাকটর শিক্ষার্থীদের কাজের খুবই প্রশংসা করলেন। এবার তিনি বাকি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ষ্টাইলে অবরোহণ অভ্যাস করতে বললেন।

ছেলেদের দ্বিতীয় দলটি ষাট ডিগ্রি কোণাকুণি রক্ ফেসের ওপর দেখল বড় একটা পাথরের স্ল্যাব রয়েছে। এটাকে বোল্ডার বলা যায়। বোল্ডারটিতে ভাল এ্যাঙ্কার করা যেতে পারে। দলনেতা বোল্ডারের গায়ে র‍্যাপেলিং রোপ ছু'ভাঁজ করে মাঝখানটায় ফিগার-অব-এইট নট্ লাগিয়ে এ্যাঙ্কার করে নিলো। এ্যাবসেলিং রোপ টেনে পরীক্ষা করে দেখল বোল্ডার থেকে খুলে আসার আশঙ্কা নেই। দ্বিতীয় দলের শিক্ষার্থীরা স্টম্যাক্ র‍্যাপেলিং করে নামার জন্য প্রস্তুত হল।

প্রথম অবরোহী কোমরে বিলে রোপ লাগিয়ে নিয়ে ছু'গাছা

এ্যাবসেলিংয়ের দড়ি কোমরের দু'পাশে দু'হাতে তুলে পেটের কাছে বেল্টের মতো করে নিলো। অর্থাৎ ডান হাতের দড়ি বাঁ হাতে এবং বাঁ হাতেরটা ডান হাতে ঘুরিয়ে নিয়ে দু'মুঠোর মধ্যে শক্ত করে দড়ি দুটো কোমরের কাছে ধরলো। হাতে গ্লাভস লাগানোই আছে। অবরোহীর মুখ কিন্তু রক্ ফেসের বিপরীত দিকে। অন্য র‍্যাপেলিং-এ অবরোহী রক্ ফেসের দিকে মুখ রেখে নিচে নামে।

অবরোহী পা দুটোকে ষাট ডিগ্রির রক্ ফেসে দেড় ফুট তফাতে রেখে দেহটা রকের সামনে নব্বুই ডিগ্রি কোণ করে চোখ সামনে রেখে নামতে লাগল। স্টম্যাক্ র‍্যাপেলিং-এ অবরোহী সাবধানে এবং ধীরে ধীরেই নামে। এই উপায়ে পিঠে প্রচুর মালপত্র নামানো যায়। অসুস্থ অথবা আহত সঙ্গীকে নামানো হয় এইভাবে।

স্টম্যাক্ র‍্যাপেলিং করার সময় দেহ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলে আপনা আপনি দড়িতে ভার পড়ে কোমরের পাশে রাখা হাতের মধ্য থেকে দড়ি প্রয়োজনমতো চলাচল করে। ইচ্ছামতো গতি বাড়ানো কমানো যায়। হাতে ধরা দড়ির মুঠো আলগা করলে গতি বাড়ে এবং মুঠো শক্ত করলে গতি কমে যায়। আপাতদৃষ্টিতে স্টম্যাক্ র‍্যাপেলিং কঠিন মনে হলেও অভ্যাস করলে এর মতো সহজ ষ্টাইল বোধহয় আর কিছু নেই। অবশ্য ভার্টিক্যাল রক্ ফেস থেকে স্টম্যাক্ র‍্যাপেলিং করা শক্ত এবং বিপজ্জনক।

প্রথম আরোহী নেমে আসার পর দ্বিতীয়জনও একই ভাবে নেমে আসে। শেষজন, অর্থাৎ লিডারও একই উপায়ে স্টম্যাক্ র‍্যাপেলিং করে নামবে, কিন্তু নামার আগে দড়ির গিঁট খুলে দিলো যাতে নিচে নেমে দড়িটা এ্যাঙ্কার থেকে খুলে নেওয়া যায়।

অবরোহণপর্ব শেষ হবার পর শিক্ষার্থীদের উত্তেজনা তুঙ্গে। ওরা আবার এ্যাবসেল করতে চায়। যে দল স্টম্যাক্ র‍্যাপেলিং করল সে দল চায় শোল্ডার র‍্যাপেলিং করতে।

এ্যাবসেলের এমনই মজা। দড়ির উপর মহাশূন্যে ঝুলে ঝুলে

নামার প্রথমটায় বিরাট এক ভীতির গ্রাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা। সাহস করে একবার যদি যথাযথ দড়িতে দেহের ভার ছেড়ে দিয়ে নামার চেষ্টা করে তা হলে ভয় তো কেটে যায়-ই, এ্যাবসেলের ষ্টাইলও সুন্দর হয়। এ্যাবসেল-এ মানসিক শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ার ভয় কমে যায়।

এ্যাবসেল করার সময় সাবধান এবং মনোযোগী না হলে, বিশেষ করে শোল্ডার র‍্যাপেলিং-এর সময়, র‍্যাপেলিং রোপ গলায় জড়িয়ে করুণ মৃত্যু হতে পারে। এমনই এক বিপদ থেকে আমি নিজে বেঁচেছিলাম। সে রোমাঞ্চকর ঘটনা মনে পড়লে আজও দেহে শিহরণ জাগে।

কয়েক বছর আগে এই শুশুনিয়া পাহাড়ের নার্সারী রকের পাশে একটা পঁচিশ ফুট উঁচু ভার্টিক্যাল রক্-এ শিক্ষার্থীদের শোল্ডার র‍্যাপেলিং দেখাবার সময় ছোট একটা ইন্‌কাট মতো জায়গায় ঠিক ঠিক পা রাখতে পারিনি। ফলে দড়ি ঘুরে যায় এবং আমি সম্পূর্ণ উল্টে যাই। ভাগ্যিস আমার দু'হাতেই দড়ি বেশ শক্ত করে ধরা ছিল তাই আছড়ে পড়িনি। পড়ে না গেলেও আমার অবস্থা তখন সঙ্গীন। পা দুটো ওপরে এবং মাথা নিচে—আমি ঝুলছি। হাতের দড়ি গলায় জড়িয়ে গেছে। খুলতে পারছি না। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ওদিকে শিক্ষার্থীরা 'গেল গেল' রব তুলেছে।

হঠাৎ একটা উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় এলো। আমি এ্যাঙ্কারের দড়িটা শক্ত করে ধরে বাঁ হাত দিয়ে থাই এবং কাঁধে জড়ানো দড়ি খুলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার পা ওপর থেকে নিচে নামল এবং মাথা ওপরে উঠে গেল। এবার দড়ি ধরে বাকি পথটা দমকলের লোকদের মতো নেমে এলাম। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

॥ এগারো ॥

পাহাড়ে ভ্রমণ (Trekking)

ভ্রমণরসিক মানুষের কাছে হিমালয়ের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। সারা ভারতের সমতলে ভ্রমণ করতে করতে এক সময় হিমালয় তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকবেই। আর এ কারণে স্মরণাতীত কাল থেকেই হিমালয়ে বহু পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

যারা ভ্রমণের সাধারণ সুখটুকু পেয়ে খুশি তারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শৈলাবাসে গিয়ে ছুটি উপভোগ করে হিমালয়ের নিসর্গশ্রী দেখে। যারা এটুকু সুখ নিয়ে সন্তুষ্ট নয় তারা হিমালয়ের তীর্থপথের দিকে পা বাড়ায়।

সব মানুষই তো আর এক স্বভাবের নয়। তাই কেউ আরামে ছুটি উপভোগ করার জন্য হিমালয়ে যায়। আবার কেউ হিমালয়ে যায় রোমাঞ্চকর স্বাদ উপভোগ করতে।

যারা রোমাঞ্চের স্বাদ পাওয়ার জন্য হিমালয়ের দুর্গম পথে ভ্রমণ অথবা অভিযানে যাত্রা করে তাদের অভিযাত্রী বলা যায়। সাধারণ ভ্রমণকারী এবং অভিযাত্রীর ভ্রমণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে অনেক। যে অভিজ্ঞতা হিমালয়ের দুর্গম পথে ভ্রমণের সহায়ক হয়।

হিমালয়কে দেবতাত্মা বলি আমরা। আমাদের কল্পজগতের বিশ্বাসের রাজ্যে সব দেবতার আবাসভূমি হিমালয়। দেবাদিদেব মহাদেব এবং গৌরীর আলয় হিমালয়ের কৈলাসে। তাই হিমালয় আমাদের কাছে দেবভূমি। এর প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। প্রতিটি শিখর দেবতার আবাস। হিমালয়ে তাই আমরা যাই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে।

বিদেশীরা হিমালয়কে দেবতা মনে না করলেও হিমালয়ের রুদ্র

রূপকে তারা সমীহ করে। আমাদের মতো ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে না এলেও তারা শ্রদ্ধা নিয়ে আসে। হিমালয়কে জয় করতে যারা এসেছে তারা হিমালয়ের শান্ত শীতল ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছে। যারা শ্রদ্ধা আর ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে এসেছে তারা হিমালয়ের আশীর্বাদ-ধন্য হয়েছে, ভালবাসা পেয়েছে।

বৈজ্ঞানিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যাবে, হিমালয়ে চ্যালেঞ্জ চলে না কেন। হিমালয়-প্রকৃতি এতই আকস্মিক যে কখন কোন দুর্যোগ নেমে আসে তা বোঝা মুশকিল। হিমালয়কে চ্যালেঞ্জ জানাতে হলে তার প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে হবে। যে কাজ মোটেই সহজ নয়। ভারতীয় সাধু-সন্ত এবং দু' একজন বিদেশী হিমালয়-প্রেমিক পর্বতারোহী হিমালয়-প্রকৃতিকে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করে বলে গেছেন, হিমালয়ে অনভিজ্ঞরা ভুলের মাসুল গুণবে যদি জবরদস্তি করে। নিজেকে রীতিমত প্রস্তুত না করে হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলে যাওয়া উচিত নয়। হিমালয়ে ভ্রমণ অথবা অভিযান করতে হলে হয় তার পর্বতারোহণ বিষয়ে শিক্ষা থাকা দরকার, নয়তো অভিজ্ঞ বন্ধু অথবা অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক—গাইডকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।

আমার মতে, হিমালয়ের সব ভ্রমণকারীকেই যে পর্বতারোহী হতে হবে তা নয়। যারা হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে, যেখানে সাধারণ মানুষ অথবা তীর্থযাত্রী যায়না, যেখানে প্রকৃত পথ বলে কিছু নেই, নেই কোনো পাকা চটি অথবা ধর্মশালা—তাদের অন্তত শৈলারোহণ শিক্ষা থাকলে ভ্রমণের সুবিধা অনেক বেড়ে যাবে।

পর্বতারোহণের শিক্ষা নেবার অনেক আগে একবার কেদার-বদরীর পথে ভ্রমণের সময় বিশেষ অসুবিধায় পড়েছিলাম। এক জায়গায় পথ ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য নতুন পথ খোলা হয়েছিল প্রায় মাইল দুয়েক ঘুরে। সাধারণ তীর্থযাত্রীরা সেই ঘোরানো নতুন

পথেই যাওয়া আসা করছে। ভাঙ্গা পথের ধারে দাঁড়িয়ে দেখলাম একটা বড় পাথর ওপর থেকে খসে পড়ে পথ ভেঙ্গেছে। পাথরটা ধরে কিছুটা নিচে নামলেই পুরনো পথ পাওয়া যায়। এতে দু'মাইল পথ কমে যায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এমন সময় একটি মারাঠী যুবক রুকস্যাক পিঠে নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। পাথর এবং ভাঙ্গা পথ দেখে আমায় বলল, দাঁড়িয়ে কেন, চলো। পাথরটা ধরে নেমে গেলেই স্ক্রী পার হয়ে ওপাবের পথ পাওয়া যাবে। (স্ক্রী অর্থাৎ ঝুরো মাটি আর বালি-কাঁকর মিশ্রিত পথ।)

কথাগুলো বলেই যুবকটি পাথর ধরে সাবলীলভাবে নিচে নেমে গেল। তারপর আবার ডাকল আমায়।

এবার আমি সাহস করে এগিয়ে গেলাম। যুবকটি যেভাবে নেমেছে তেমন ভাবে নামতে গিয়ে দেখলাম অসম্ভব। হাত-পা পিছলে যাচ্ছে। আমার অবস্থা দেখে ছেলেটি আবার পাথরটার ওপর উঠে এসে পাথরের খাঁজ আর ফাটল ধরে কেমন করে নামতে হয় তা দেখিয়ে দিতে অতি কষ্টে নেমে এলাম।

ঝুরো মাটির পথটা যুবকটি আমার হাত ধরে পার করে দিলো। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত সব শিখলে কি করে?

জবাবে বলল, পর্বতারোহণের ট্রেনিং নিয়েছি। সেখান থেকেই পাথর ঝুরোমাটি এবং বরফে ওঠানামা শিখেছি।

পর্বতারোহণের উপযোগিতা সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম।

শৈলারোহণ শিক্ষাক্রমে এ সবই শেখানো হয়, কেবলমাত্র বরফের কাজ ছাড়া। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনষ্টিটিউটে শৈলারোহণ এবং বরফের ট্রেনিং দেওয়া হয় সিকিমের রাথং হিমবাহে।

অল্প খরচে শৈলারোহণ শিক্ষা নিয়ে হিমালয়ের যে কোনো দুর্গম অঞ্চলে নির্ভাবনায় ভ্রমণ করা চলে।

হিমালয়ে ভ্রমণ অথবা অভিযান করতে হলে হিমালয়ের ভৌগোলিক জ্ঞান কিছুটা থাকা দরকার। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ আছে। শিক্ষার্থীরা সে সব গ্রন্থ সংগ্রহ করে পড়ে নিতে পারলে উপকারই হবে। এখানে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

হিমালয় পর্বতমালা উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রসারিত। এর ভারতের দিক উন্নতোদর (convex) এবং তিব্বতের দিক গহ্বরোদর (concave)। দক্ষিণে ভারতের দিকে পর্বতমালার ঢাল খুবই খাড়াই কিন্তু তিব্বতের দিকে সেই খাড়াই ঢাল ধীরে ধীরে নেমে গিয়ে প্রায় সমতল উচ্চ ভূমিতে শেষ হয়েছে। উত্তর তিব্বতের দিক থেকে প্রচণ্ড পার্শ্বচাপের ফলে তিনটি ভাগে বর্তমান হিমালয়ের উন্নতি হয়েছে। ভারতের দিকের অংশ সেই পার্শ্বচাপ সহ্য করায় সহায়তা করেছিল বিরাট গিরিশিরা—আরাবল্লী পর্বতমালা এবং উত্তর-পূর্বদিকের আসাম পর্বতমালা। এই দুই অঞ্চলের পাথর খুবই নরম এবং ভাঙ্গা-চোরা।

হিমালয় একটি সম্পূর্ণ পর্বতমালায় গ্রথিত নয় বরং অনেকগুলো পর্বতমালার মিলিত নাম। এই পর্বতমালাগুলো নানা নদী দ্বারা বিভক্ত, বিভক্ত বহু উপত্যকার কারণে। যেমন, কাশ্মীর উপত্যকা, কাংড়া এবং কুলু উপত্যকা ইত্যাদি। পূর্বদিকের তুলনায় পশ্চিম দিকের নদীর অববাহিকা খুবই প্রসারিত। হিমালয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ২৫০ মাইল। উত্তরদিকের পর্বতগাত্র সবুজ বৃক্ষরাজিতে ভরা এবং উঁচু অঞ্চলে বরফ ঢাকা থাকে। পূর্ব হিমালয়ে নেপাল এবং সিকিম বাংলাদেশের সমতলভূমি থেকে এমনই হঠাৎ উত্থিত হয়েছে যে তাদের হিমশিখরগুলিও সমতলে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। পশ্চিম হিমালয়ে কিন্তু এমনটি দেখা যায় না।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে হিমালয়কে আড়াআড়িভাবে চারটি অংশে বিভক্ত করা যায়—

ক) ইন্দাস থেকে সাটলেজ এই ৩৫০ মাইল—পাঞ্জাব হিমালয়।

খ) সাটলেজ থেকে কালী নদী, ২০০ মাইল—কুমায়ুন হিমালয়।

গ) কালী থেকে তিস্তা নদী, ৫০০ মাইল—নেপাল হিমালয়।

ঘ) তিস্তা থেকে ব্রহ্মপুত্র নদী, ৪৫০ মাইল—আসাম হিমালয়।

লম্বালম্বিভাবে হিমালয় তিনটি নির্দিষ্ট সমান্তরাল গিরিশিরায় বিভক্ত। বিভিন্ন উচ্চতার নিরিখে এদের নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়—

ক) বৃহত্তর হিমালয়—হিমরেখার ওপরে বিশ হাজার ফুট এবং তদূর্দ্ধ উচ্চতার পর্বতমালা নিয়ে গঠিত। নামকরা বড় বড় শিখর এ অঞ্চলেই অর্থাৎ বৃহত্তর হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত।

খ) অল্প উচ্চ অর্থাৎ মধ্য হিমালয়—বৃহত্তর হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতমালার সমান্তরাল অল্প উচ্চতার পর্বতমালা যার উচ্চতা বারো হাজার ফুট থেকে পনেরো হাজার ফুটের মধ্যে তাদের নিয়েই মধ্য হিমালয় অঞ্চল গঠিত। এর প্রস্থ প্রায় ৫০ মাইল।

গ) বর্হিহিমালয় বা শিবালিক রেঞ্জ—দক্ষিণের তিন থেকে চার হাজার ফুট উচ্চতার গিরিশ্রেণী নিয়ে গঠিত।

১৫০০ মাইল বিস্তৃত হিমালয়ের একই অথবা সমান্তরাল ভাবে পাশাপাশি থাকা পর্বতমালার শিলা-চরিত্র কিন্তু আলাদা। শিলার বিভিন্নতা অনুযায়ী হিমালয়কে তিনটি সমান্তরাল বিভাগে বিভক্ত করা যায়—

১। তিব্বত অঞ্চল—বৃহত্তর হিমালয় থেকে অবস্থিতি অনেক দূরে। এই অঞ্চলের শিলা প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ দ্বারা গঠিত পলি পাথর (Sedimentary Rock)।

২। বৃহত্তর ও মধ্য হিমালয়ের অন্তর্বর্তী অঞ্চল পরিবর্তনশীল (Metamorphic) এবং স্ফটিকময় (Grystalline) অপ্রস্তরীভূত শিলা দ্বারা গঠিত।

৩ বর্হিহিমালয় অঞ্চল বা শিবালিক রেঞ্জ আধুনিক শিলা যথা বেলেপাথর (Sand Stone), কাদা, ইত্যাদি দ্বারা গঠিত

এ অঞ্চলের পাহাড়গুলি কোণাকুণি এবং শিখরদেশ সূচলো। পাহাড়ের ঢাল সরল কিন্তু সব জায়গায় একই রকম নয়। একটানা এবং খাড়াই গিরিশিরা না হওয়ায় উদ্ভিদ আছে প্রচুর। নদী উপত্যকার অধিকাংশ 'V' আকারের পাথর এবং জন্মকালের হিসাবে এরা নবীন।

হিমালয় ভ্রমণ অথবা অভিযান-স্থচী তৈরি করার সময় হিমালয়ের ভৌগোলিক জ্ঞান অনেক সাহায্য করে। যে অঞ্চলে ভ্রমণের পরিকল্পনা করা হবে সেখানকার অবস্থা জানা থাকলে আগে ভাগে ব্যবস্থা করা যায়।

হিমালয় ভ্রমণের প্রথম কথা, কোন অঞ্চল ভ্রমণ-স্থচীর অন্তর্ভূক্ত করা হবে। বিরাট হিমালয়ে দর্শনীয় বহু জায়গা আছে। পরিচিত তীর্থপথ হলে ভাবনা কম, কারণ অনেকেই সে অঞ্চলে ঘুরে এসেছে, তাদের কাছ থেকে অক্লেশে পথের বিবরণ, স্থবিধা-অস্থবিধা এবং খরচপত্র জেনে নেওয়া যায়। কিন্তু যে অঞ্চল স্বল্প পরিচিত মুশকিল সেখানেই।

অনেক যুবককে দেখেছি সম্পূর্ণ নতুন অঞ্চল অন্বেষণ করে ভ্রমণের আয়োজন করতে। নতুন অঞ্চল হলে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় অনেক বেশি। যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুই লাভ, বাকিটা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সমাধান করতে হয়। অজানা অঞ্চলের স্থবিধা অস্থবিধা জানা না থাকায় বিপদ ঘটে পদে পদে। আর এই বিপদ এবং অস্থবিধার মধ্যে নিজেদের অভিষ্ট পথে ভ্রমণ শেষ করে আসার মধ্যে যে রোমাঞ্চ আর আনন্দ পাওয়া যায় তা কিন্তু পরিচিত পথে ভ্রমণ করে পাওয়া যায় না।

আগেকার দিন হলে এই ভ্রমণ-স্থচীর চিন্তা অস্থির করে তুলত। কারণ তখন খুব কম লোকই ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হিমালয়ে যেত।

বিশেষ কয়েকটি পরিচিত তীর্থপথ ছাড়া আর কিছুই সহজে জানা যেত না। আজকাল বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে হিমালয় ভ্রমণ এমন কি অভিযান নিয়েও। তাই আজ কোনখানে যাব এ চিন্তা অস্থির করে না। ভ্রমণ এবং অভিযান গ্রন্থগুলি ঘাঁটলেই পথের হদিশ পাওয়া যায়। লেখকের "হিমালয় ভ্রমণ ও গাইড" গ্রন্থ এমনই একটি হিমালয়-পথনির্দেশিকা। তাছাড়া বর্তমানে অনেক হিমালয় ভ্রমণ সংস্থা এবং পর্বতারোহণ সংস্থা স্থাপিত হয়েছে, যেখান থেকে হিমালয়ে ভ্রমণের বহু জ্ঞাতব্য খবরই পাওয়া যেতে পারে এবং সহজেই ভ্রমণ-সূচী তৈরি করে বেরিয়ে পড়া যায়।

হিমালয়ের সীমান্ত বিরোধ এবং চীনের সঙ্গে লড়াই-এর পর হিমালয়ের ম্যাপ আজ সাধারণ ভ্রমণকারীর নাগালের বাইরে। ম্যাপ নিয়ে হিমালয়ে ভ্রমণও নিষিদ্ধ। ফলে হিমালয়ে যাবার পূর্বে সে অঞ্চলের সম্যক জ্ঞান আগেভাগে আহরণ করা যায় না। আর সে কারণে ভ্রমণকারীর নানাবিধ অসুবিধা এমন কি বিপদের মুখেও পড়তে হয়। ম্যাপ ছাড়াই যখন হিমালয় ভ্রমণ করতে হবে তখন ম্যাপ নিয়ে বেশি না ভাবাই শ্রেয়। ম্যাপের পরিবর্তে পর্বতাভিযান এবং হিমালয়ে ভ্রমণ বিষয়ক বই ভালভাবে পড়ে নিতে পারলে লাভ কম হয় না। অবশ্য পর্বতাভিযানে ম্যাপ অবশ্যই দরকার।

হিমালয় ভ্রমণের সবচেয়ে ভালো সময় গ্রীষ্ম এবং শরতকাল। ইংরাজী এপ্রিল থেকে জুন মাস এবং আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত হিমালয়ে ভ্রমণ এবং অভিযানের পক্ষে প্রশস্ত সময়।

ভ্রমণের স্থান এবং কাল ঠিক হয়ে গেলে দল গঠনের দিকে নজর দিতে হবে। সর্বনিম্ন দুই এবং সর্বোচ্চ চার জনের দলই আদর্শ। দলের সভ্য সংখ্যা বেশি হলে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে থাকা খাওয়া এবং মালপত্র নিয়েই সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া নানা মুনির নানা মত তো আছেই।

দল বড় হলে একজন নেতা নির্বাচন করতে হবে। নেতা নির্বাচন করার সময় দেখতে হবে তার অভিজ্ঞতা কতটা। পর্বতারোহণে শিক্ষাপ্রাপ্ত সদস্যকে নেতা করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য হিমালয়ে তার কিছু ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থাকা ভালো। দল গঠন হয়ে গেলে তবেই ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া যাবে।

ভ্রমণের সময় কোথায় রাত কাটানো হবে তা আগেই ঠিক করে নিতে হবে। তীর্থপথে চার-পাঁচ মাইল অন্তর রাত কাটাবার মতো চটি এবং ধর্মশালা সামান্য ভাড়ার পরিবর্তে অথবা বিনা ভাড়ায় পাওয়া যায়। অনেক স্থানে চটিতে কম্বল এবং লেপ ভাড়ায় পাওয়া যায়। চটি ধর্মশালা ছাড়াও ডাকবাংলো আছে অনেক জায়গায়। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় সন্দকফু এবং ফালুট-এর পথে ইউথ হোষ্টেল এবং সরকারী বিশ্রামগৃহ আছে। এখানে সামান্য ভাড়ায় আরামে থাকার ব্যবস্থা আছে। টুরিস্ট অফিসে খোঁজ খবর করলে হোষ্টেলে রাত্রিবাসের অনুমতি পাওয়া যায়।

যে সব দুর্গম স্থানে চটি ধর্মশালা অথবা ডাকবাংলো নেই সেখানে তাঁবু নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়।

রূপকুণ্ড এবং সুন্দরডুঙ্গা উপত্যকা খুবই দুর্গম অঞ্চল। গাড়োয়াল এবং কুমায়ুন হিমালয়ে এ দুটি স্থান অবস্থিত। শেষ গ্রাম থেকে এ দুটি অঞ্চলই দু-তিন দিনের হাঁটা পথে কোনো চটি অথবা বাংলো নেই। অবশ্য পথে পাহাড়ের গায়ে গুহা আছে। গুহামুখ পলিথিন সিট অথবা ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে নিলে ঘরের আরাম পাওয়া যায়। সঙ্গে তাঁবু থাকলে যাত্রার নিরাপত্তা থাকে। রূপকুণ্ড ও সুন্দরডুঙ্গার পথের পূর্ণ বিবরণ লেখকের "ত্রিশূলী তীর্থের পথে" এবং "অভিযাত্রী তীর্থ সুন্দরডুঙ্গা" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

প্রচলিত তীর্থপথে ভ্রমণ তেমন অসুবিধে নেই। কিন্তু অজানা অথবা অল্প জানা অঞ্চলে ভ্রমণ করতে হলে সঠিক পথ বের করা প্রয়োজন। হিমালয়ে পথ হারালে ভোগান্তির একশেষ। ম্যাপ যখন আমাদের

নাগালের বাইরে তখন সে অঞ্চলের পরিচিত গাইড সঙ্গে রাখা উচিত। গাইড থাকলে পথ হারাবার সম্ভাবনা থাকে না। অনেক জায়গায় মালবাহকরা গাইডের কাজ করে। তাদের নেওয়াই সুবিধা। পথ দেখানো এবং মালপত্র বহন করার একটি লোক নিলে গাইডের জন্য আলাদা খরচ করতে হয় না।

সব সময় সহজ পথ বেছে নেওয়া উচিত। অনেকে সময় বাঁচাবার জন্য পাকদণ্ডি পথ ধরে গন্তব্যস্থলে পৌছবার চেষ্টা করে। এতে ভ্রমণকারী অল্পেই ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে থাকে ঘন ঘন এবং ফলে দেখা যায় সহজ পায়েচলা পথের দূরত্ব বেশি হলেও পাকদণ্ডি পথের অল্প দূরত্ব বেশি সময় নেয়। তাছাড়া পাকদণ্ডি অনেক সময় ভুল পথে পরিচালিত করে।

হিমালয়ের পথে চলার কিছু নিয়ম কানুন আছে। এ আইন অবশ্য যে কোনো পাহাড়ে এবং জংগলের পথেও প্রযোজ্য। দলের প্রতিটি সদস্যের এই নিয়ম কানুন নিষ্ঠাভরে পালন করা কর্তব্য।

চলার সময় সবাই এক সাথে চলবে। কেউ কাউকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে না। দলের সব সদস্যের তো আর সমান হাঁটার ক্ষমতা থাকে না। কেউ দ্রুত হাঁটতে পারে, কেউ আবার মন্থর। সুতরাং মন্থর সদস্যের চলার হিসাবেই সকলকে হাঁটতে হবে। তাহলেই দলের মধ্যে কোনো ব্যবধান রচিত হবে না। সদস্যদের হাঁটার মধ্যে গতির সমতা না থাকলে বিশেষ করে পিছনে পড়ে থাকা সদস্যের পথ হারাবার সম্ভাবনা থাকে। তার চেয়ে বেশি হয় মানসিক দুর্বলতা। পিছিয়ে পড়া সদস্য যদি মনে করে তাকে পিছনে রেখে অন্যেরা এগিয়ে গেছে তাহলে আর তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সে সব সময় ভাববে যে তার দ্বারা অগ্রবর্তী সদস্যের সঙ্গে গতির সমতা রাখা সম্ভব নয়। তখন সে আরও পিছিয়ে পড়বে এবং সে অবস্থায় দলের সমন্বয় একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর এর ফলে দলের সংহতিতেও ফাটল ধরবে। সুন্দর একটা ভ্রমণ নষ্ট হতে

পারে। তার চেয়ে বেশি হতে পারে প্রাণহানীকর বিপদ। আমাদের একটি পর্বত অভিযানে এ-রকম পিছিয়ে পড়া এক সদস্যের নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার ঘটনা বলছি পরে।

প্রতিদিন কতটা পথ অর্থাৎ দূরত্ব, হাঁটা হবে তা আগেভাগে ঠিক করে নেওয়া উচিত। পাহাড়ে দূরত্ব ঠিক করতে হয় চড়াই-উৎরাই বিচার করে। একটানা চড়াই পথ হাঁটতে হলে পাঁচ-ছয় মাইলের বেশি এক দিনের পদযাত্রার সুচীতে রাখা উচিত নয়। সাধারণত তিন মাইল বা এক হাজার ফুট উচ্চতার পথ এক ঘণ্টায় হাঁটা যায় বড় জোর। অর্থাৎ যেখান থেকে হাঁটা শুরু হচ্ছে সেখান থেকে তিন মাইল দূরত্বের স্থান যদি শূন্য থেকে এক হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত ধীরে ধীরে ওঠে তাহলে সময় লাগবে এক ঘণ্টা। এই হিসাবে সারাদিনের পথের দূরত্ব ঠিক করতে হবে। মোট সময়ের সঙ্গে বিশ্রামের জন্য অন্তত দু'ঘণ্টা বেশি সময় যোগ করতে হবে। উৎরাই অথবা সমতল পথে ঘণ্টায় চার মাইল হাঁটা যায়। তবে সারা দিনে দশ-বারো মাইলের বেশি হাঁটা উচিত নয়। হিমালয় ভ্রমণ আনন্দের জন্য, 'ডেলি-প্যাসেঞ্জারের' তাড়া থাকলে সে আনন্দ কিন্তু ভোগ করা যায় না।

হাঁটার মধ্যে একটা 'ছন্দ' থাকা উচিত। 'ছন্দ' অর্থাৎ প্রতিটি পদ-ক্ষেপ মাপা জোকা। পায়ে হাঁটা শুরু করার সময় গতি যেমন থাকবে, তেমনই শেষ করার সময় সেই গতি একই রকম থাকবে। অনেকে পদযাত্রার শুরুতে খুবই তাড়াতাড়ি হাঁটে। ভাবে তাড়াতাড়ি হাঁটলেই বুঝি তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে গন্তব্যস্থলে। তা কিন্তু হয় না। সমতল পথে তাড়াতাড়ি হেঁটে কঠিন চড়াই-এর কাছে এসে তাদের দম ফুরিয়ে যায় এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তারা মরার মতো শুয়ে পড়ে। পরবর্তী কাজগুলো আর করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। কিন্তু হাঁটার মধ্যে ছন্দ থাকলে এমনটা হয় না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই গতিবেগ থাকলে শক্তি-সামর্থ শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। তাই নিত্যকার পদযাত্রার সময় ছন্দবদ্ধভাবে হাঁটা উচিত।

প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর বিশ্রাম নেওয়া উচিত। বিশ্রাম দশ থেকে পনেরো মিনিটের বেশি হওয়া উচিত নয়। ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে থাকলে হাঁটার ক্ষমতা কমে যাবে এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগেই রাতের আঁধার নামতে পারে। মনে রাখতে হবে, রাত হবার আগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেই হবে। দুর্গম পথে রাত্রে হাঁটা খুবই বিপজ্জনক।

হাঁটার সময় দলনেতা সবার আগে থাকে। পিছনেও একজন দায়িত্বশীল সদস্যের থাকা উচিত। বড় দল হলে এ ব্যবস্থা করতেই হবে। নেতাকে মাঝে মাঝেই পিছন ফিরে দলের সদস্যদের খোঁজ খবর নিতে হবে এবং কেউ যদি পিছনে পড়ে থাকে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সবাই একত্রিত হলে তবে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

উৎরাই পথে হাঁটার কষ্ট কম বলে গতি বাড়ে। উৎরাই পথে বিশেষ করে ভ্রমণ শেষে ঘরে ফেরার সময় বহু দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। দিনের পর দিন দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে থাকার ফলে মানুষের সমাজে ফেরার জন্য প্রচণ্ড আকুলতা বাড়ে। ফলে উৎরাই পথে দ্রুত নামার জন্য দুর্ঘটনা ঘটে। ফেরার সময় উৎরাই পথে তাই খুব সাবধান হওয়া উচিত।

আমাদের অভিযানের পিছিয়ে পড়া সদস্যটির ঘটনাটা বলি এবার।

...১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিনটিতে উনিশ হাজার ফুট উঁচু এক নং শিবিরে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। বড় একটা মেস টেণ্টের মধ্যে আমরা তিনজন সদস্য আর দু'জন শেরপা বসে আছি। একটা পরাজিত দলের মানসিকতা আমাদের। মানাপর্বত (২২,২৯০ ফুট) শিখর অনেক চেষ্টা করেও আরোহণ করতে পারিনি। সেদিন সকালেই আমরা ওই এক নং শিবিরে ফিরেছি ওপর থেকে। দুপুরে দলের ডাক্তার সদস্য অন্য একজন অসুস্থ শেরপাকে নিয়ে নেমে গেছে

্লে শিবিরে। ওদের বলে দিয়েছি মূল শিবির থেকে সব মালবাহকদের ওপরে পাঠাতে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঝড়ের গতি বেড়েছে আরো বেশি। ঝড়ের সঙ্গে দারুণ তুষারপাত হচ্ছে। তাঁবুর ওপর ঝড় আছড়ে পড়ছে যেন। একটা গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে হাওয়ায়। আকাশের চেহারা দেখে নিজেদের আর নিরাপদ বলে মনে হল না। তাঁবু যেমন দুলছে, তাতে যে কোনো মুহূর্তে ওটি ভেঙ্গে পড়তে পারে অথবা হাওয়ায় ভেসে হিমবাহের অপরপ্রান্তে আছড়ে পড়তে পারে। মৃত্যু অনিবার্য!

নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে নিজেরাই যখন আশংকিত ঠিক তখনই হুড়দাড় করে ছয় সাতজন মালবাহক তাঁবুতে প্রবেশ করল। ওরা এই দুর্যোগে এলো কি করে তাই ভেবে অবাক হই। এমন সময় ওদের মধ্যে একজন বলল, এক সাব পিছে হ্যায়। ও সাব আসতে পারছে না। হালত খুব খারাপ।

মাথায় বাজ পড়ল যেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কোন সাব?

—যো সাব কভ্‌ভি উপরমে নহি আয়া।

হঠাৎ মনে পড়ল, আমাদের কোয়ার্টার মাষ্টার তো কখনো আসেনি ওপরের ক্যাম্পে, তবে কি সে-ই পিছিয়ে পড়েছে!

চটপট পায়ে ক্লাইমিং বুট পরতে পরতে শেরপাদের বললাম, জলদি তৈরি হয়ে নাও। সাবকে নিয়ে আসতে হবে।

টর্চ হাতে নিয়ে সেই দুর্যোগে আমরা চারজন বেরিয়ে পড়লাম তাঁবুর বাইরে। প্রচণ্ড তুষার ঝড় আর নিবিড় ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। প্রায় ঘণ্টাখানেক আমাদের ক্যাম্পের নিচে আইস-ফলের কাছে খোঁজাখুঁজি করে ভাগ্যক্রমে একটা বরফের গুহার মধ্যে অচেতন অবস্থায় বন্ধুটিকে পেলাম।

ক্যাম্পে এনে জ্ঞান ফেরাতে আরো একঘণ্টা লাগল। সুস্থ হতে ওর কাছে জানলাম—

মূল শিবির থেকে আমাদের খবর নেবার জন্য সকালবেলায়

বেরিয়েছিল। বেশ ভাল হাঁটছিল প্রথম থেকেই। একটা হিমবাহ অতিক্রম করার পর দেখা হয় ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার ওকে নেমে যাবার পরামর্শ দেয়। কারণ ডাক্তারের ধারণা হয়েছিল যে ও আইসফল পার হতে পারবে না। ডাক্তারের কথায় জেদ বেড়ে যায় এবং ওপরের ক্যাম্পে আসাই মনস্থ করে।

পথ যখন শেষ হয়ে এসেছে তখনই ঝড় শুরু হয়। আর ঝড় শুরু হতেই সঙ্গী মালবাহকরা ওকে নানারকম ভয় দেখিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে বলে। শেষে তুষার ঝঞ্ঝা শুরু হতেই মালবাহকরা ওকে ফেলে পালিয়ে আসে ক্যাম্পে।

একে তুষার ঝঞ্ঝা তায় অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ও খুবই মুষড়ে পড়ে। তবু চলা বন্ধ করেনি। একাকী নিঃসঙ্গ হয়ে পথ চলতে চলতে ডাক্তারের কথা মনে পড়ে। ওর ধারণা হয় আর পৌঁছতে পারবে না এক নং শিবিরে। এ ধারণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিপর্যয় শুরু হয়ে যায়। ও অনুভব করে যে ওর হাতে পায়ে জোর নেই। দারুণ শীত ওকে কাঁপিয়ে দেয়। অবধারিত মৃত্যু আসন্ন বুঝে ও আইসফলের মধ্যে একটা বরফের গুহায় আশ্রয় নেয়। বুদ্ধি করে ফেদারকোট আগেই পরে নিয়েছিল এবং হাতের টর্চ জ্বালা অবস্থায় গুহার বাইরে মুখ করে রেখে ছিল। সেই আলোর ক্ষীণ উৎস ধরেই ওকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল।

দলছুট হয়ে গেলে বিপদ কতটা হতে পারে এ ঘটনা থেকে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

পাহাড়ে বিপদ-আপদ (Mountain Hazards)

পর্বত আরোহণে বিপদ পায়ে পায়ে ঘোরে।

বিপদকে যে সময়মতো চিনতে পারে বুঝতে পারে, সে কিন্তু বিপদের হাত থেকে রেহাই পায়। মৃত্যু যেখানে অবধারিত, সেই

মৃত্যুকে কৌশলে ফাঁকি দেওয়ার রোমাঞ্চ আছে, আনন্দ আছে। পাকা পর্বতারোহী, শৈলারোহী অথবা হিমালয় ভ্রমণকারী মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে আনন্দ পায়, আর পর্বতারোহণের রোমাঞ্চ সেখানেই। না হলে Edward Whymper চার চারটে খ্যাতনামা পর্বতারোহীর মৃত্যুর কারণ হয়েও শতবছর পরে তাবৎ পর্বতারোহীর শ্রদ্ধার আর ঈর্ষার পাত্র হবেন কেন ?

পর্বতারোহণে ছোট অথবা বড় ধরণের দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু যত ঘটে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষের মৃত্যু হয় গাড়ির চাকার নিচে, ট্রেন আর এ্যারোপ্লেন দুর্ঘটনায়। বাড়ির ছাদ ধসেও লোক মরে, কলার খোসায় আছাড় খেয়ে পা ভাঙ্গে। দুর্ঘটনা কোথায় নেই ? প্রাত্যহিক জীবনেও তো দুর্ঘটনা আমাদের সঙ্গী। তাই দুর্ঘটনার ভয়ে হিমালয় যাত্রা অথবা অভিযান বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং বেড়েছে।

হিমালয়ের সম্ভাব্য বিপদ এবং দুর্ঘটনার কথা আলোচনা করব। দুর্ঘটনা থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায় সে আলোচনায় আসব পরে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়—যেমন, ঝড় তুষার ঝঞ্ঝা, হিমানী সম্প্রপাত প্রভৃতি।

সাধারণ বিপর্যয়—পাথর ভেঙ্গে পড়া, কঠিন শৈলশিরা অথবা বরফের দেওয়াল থেকে পিছলে পড়া, হিমবাহ গহ্বরে (Crevasse) পতন ইত্যাদি।

শারীরিক বিপর্যয়—নিউমোনিয়া, তুষারক্ষত, অতি-উচ্চতা জনিত রোগ, তুষারান্ধতা ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে হিমানী সম্প্রপাত সবচেয়ে ভীতিজনক এবং এর কবলে পড়ে নিস্তার পাওয়া অনেকটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। হিমানী সম্প্রপাত (Avalanche) হয় হিমরেখার ওপরে। অত্যধিক তুষারপাতের ফলে পাহাড় থেকে জমাট তুষারস্তূপ হঠাৎ নেমে আসে। অনেক সময় তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে জমাট শক্ত

বরফে ফাটল ধরে হিমানী সম্প্রপাত হতে পারে। হিমানী
সম্প্রপাতে শত শত মন বরফ বিরাট এলাকা জুড়ে নেমে আসে
সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে। এ্যাভালান্সের প্রচণ্ড গতির মুখে বড় বড়
পাথর তাঁবু মানুষ সব কিছু অসহায়।

শিবির স্থাপন করার আগে দেখে নিতে হয় মাথার ওপরে নতুন
তুষার স্তূপ আছে কিনা, থাকলে কি অবস্থায় আছে। যদি এতটুকু
সন্দেহ হয় তাহলে সেখানে শিবির স্থাপন করা চলবে না। কারণ
কখন যে হিমানী সম্প্রপাত এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কে জানে!
ভারতীয় নন্দাদেবী পর্বত অভিযানের সময় এমন এক শিবির স্থাপন
করে অভিযাত্রীরা খারাপ আবহাওয়া দেখে নিচের শিবিরে নেমে আসে
দলনেতার শেষ মুহূর্তের নির্দেশে। পরদিন ওপরের শিবিরে উঠে
দেখে কোথাও শিবিরের কোনো চিহ্ন নেই। বিরাট এক হিমানী
সম্প্রপাত শিবিরগুলিকে অজস্র মালপত্র, খাদ্য ও সাজ-সরঞ্জাম
সহ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, কেউ জানে না। দলনেতা
কমাণ্ডার কোহলীর বাস্তব অভিজ্ঞতা দলের বহু সদস্যের প্রাণ বাঁচিয়েছে
ওই শিবিরে আগের রাত্রে অবস্থান না করায়।

আরোহণের পথ খোঁজার সময় হিমানী সম্প্রপাতের সম্ভাব্যতার
দিকে সর্বদা নজর রাখতে হয়। দেখা গেছে অনেক সময় আরোহীদের
তৈরি করা পথ এ্যাভালান্সের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বরফে পথ
তৈরি করার সময় আমি নিজে একবার এ্যাভালান্সের মুখে পড়ে
ভাগ্যগুণে প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছি। বরফে পথ তৈরি করার
সময় আকাবাঁকা ভাবে পথ তৈরি করা উচিত। জিগজ্যাগ ভাবে
পথ বানালে শক্ত বরফে ফাটল সৃষ্টি হয়না এবং এ্যাভালান্স
রোধ করা যায়।

এ্যাভালান্স এলে তার গতিপথ থেকে ত্বরিৎ গতিতে দূরে সরে
যেতে হবে। বরফের স্তূপ ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার আগে বরফে
আইস এক্স গেঁথে পিঠের রুকস্যাক মাথার ওপর তুলে নিয়ে মাটি

কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। যদি এ্যাভালান্সের গতিপথে ভাসিয়ে নেয় তাহলে তুষার স্রোতের ওপর ভেসে থাকার চেষ্টা করতে হবে। নাক-মুখ দু'হাত দিয়ে ঢেকে রাখলে বরফ ঢুকে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করতে পারবে না। এ্যাভালান্স থেমে গেলে যেদিকে চড়াই পথ অনুভূত হবে সেদিকে উঠে আসতে হবে। কারণ এ্যাভালান্সের নরম বরফের নিচে চাপা পড়ে গেলে পথ দেখা সম্ভব নয়। মজার ব্যাপার তুষার স্তূপের নিচে যথেষ্ট অক্সিজেন থাকে। নাক-মুখ সাফ্ রাখতে পারলে অক্সিজেন পাওয়া যায়।

হিমালয়ের হিমানী সম্প্রপাত পর্বতাভিযাত্রীর পরম শত্রু। সেই শত্রুর হাত থেকে বাঁচার সব রকম চেষ্টা করতে হবে পর্বতারোহীদের।

ঝড় এবং তুষারঝড়ও কম শত্রু নয়।

ঝড়ের গতি যদি ঘণ্টায় দেড়-দু'শ মাইল হয় তাহলে মানুষকে পর্যন্ত উড়িয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আছড়ে ফেলতে পারে। এই ঝড়ে তাঁবুর অবস্থা হয় প্রচণ্ড স্রোতে মোচার খোলার মতো।

পথ চলার সময় ঝড় উঠলে বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিতে হবে। পাথর কিংবা বায়ুরোধকারী কোনো আশ্রয় না থাকলে মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে পড়তে হবে। রুকস্যাক যথারীতি মাথার সামনে থাকবে, যাতে হাওয়ায় গড়িয়ে আসা পাথরের আঘাত না লাগে।

শিবিরে অবস্থান কালে ঝড় উঠলে তাঁবুর মধ্যে ভারী মালপত্র পুরে নিতে হবে। তারপর তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করে তাঁবুর পোল ধরে তার পতন রোধ করতে হবে। না হলে ঝড়ের ঝাপটায় তাঁবু উড়িয়ে নিতে পারে। এ কারণেই শিবির স্থাপন করার সময় বায়ুর গতিপথে পাথর বা দেওয়ালের আড়াল খোঁজা হয়। তাঁবু পাতার পর তার চারধারে পাথর চাপিয়ে দিলে ঝড়ে উড়ে যাওয়ার হাত থেকে তাঁবু বাঁচানো যায়।

ভ্রমণের সময় ঝড়ের আশংকা দেখলে দলের সদস্যদের একত্রিত হওয়া উচিত। কারণ ঝড় উঠলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। ঝড় ওঠার আগে গায়ে বায়ু প্রতিরোধক পোষাক—উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেট এবং ট্রাউজার পরে নিতে হয়।

সাধারণ বিপর্যয়ের সব কটিই ভীতিজনক।

পাথর ভেঙ্গে পড়া—রক্ ফল, হিমালয়ের তুষারশূন্য অঞ্চলের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বিশেষ করে সরু গলি-পথ এবং হিমবাহ সংলগ্ন ত্ব'ধারের খাড়া দেওয়াল থেকে অহরহ পাথর খসে পড়ে। এই খসে পড়া পাথরের আঘাতে বহু বিপর্যয় ঘটে।

গলি-পথ অথবা সংকীর্ণ হিমবাহ ধরে হাঁটার সময় মাঝবরাবর চলতে হবে। কান এবং দৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে। পাথর গড়ানোর আওয়াজ আগেভাগে পাওয়া যায়। সাবধান হবার সময়ও পাওয়া যায় সজাগ থাকলে। বালাক্লাভা টুপি দিয়ে এ কারণেই কান ঢাকা উচিত নয়। দলের সদস্যরা এ পথে একসঙ্গে না চলে বরং ছাড়া ছাড়া অর্থাৎ বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। পাথর গড়িয়ে এলে একসঙ্গে অনেকে থাকলে কাউকে না কাউকে আঘাত করবেই। দূরত্ব বজায় রাখলে সেই আশংকা থাকে না। গলির চড়াই পথে আরোহণের সময় বিলে দড়ি খুলে নিতে হবে। আলগা পাথর যাতে পায়ে লেগে গড়িয়ে না যায় সেদিকেও নজর রাখতে হবে, কারণ গড়িয়ে পড়া পাথর নিজের সতীর্থদের আঘাত করতে পারে।

খাড়া শৈলপ্রাচীর অথবা বরফের দেওয়াল আরোহণের সময় পা পিছলে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। এই পতনের দুর্ঘটনায় আরোহী অথবা অবরোহীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

সাধারণত শৈলপ্রাচীরের আলগা পাথরে হাত অথবা পা রাখা উচিত নয়। আলগা পাথর খসে গেলে পতন অনিবার্য। গ্রিপ করার সময় দেখতে হবে পাথরটি মজবুত কিনা। হাত দিয়ে সাবধানে পাশাপাশি নেড়ে দেখলে বোঝা যায়। কখনো সামনের দিকে টেনে

পরীক্ষা করা উচিত নয়। কারণ পাথর খসে এলে সেই টানেও পতন ঘটবে। ভালভাবে বিলে করা উচিত তা হলে পতনজনিত আঘাত সামান্যই লাগবে।

বরফের দেওয়াল আরোহণ বেশ কঠিন। জিগজ্যাগ ভাবে তুষার কুঠারের সাহায্যে পা রাখার ধাপ তৈরি করে হাত দিয়ে ধরার মতো হোল্ডস্ বানিয়ে নিতে হবে। সাবধানে ক্র্যাম্পন ব্যবহার করলে পতন রোধ হবে। বুটের নিচে ক্র্যাম্পন লাগিয়ে আরোহণের প্যাণ্ট অথবা মোজার সঙ্গে ক্র্যাম্পনের কাঁটা যাতে জড়িয়ে না যায় সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে। এখানেও ভালভাবে দড়ির বিলে করা দরকার। শৈলপ্রাচীরের মতো বরফেও পিটন ব্যবহার করা যেতে পারে। বরফে স্ক্রু পিটন খুবই উপযোগী।

হিমবাহ গহ্বর অর্থাৎ ক্রিভাস হিমবাহের তাপের তারতম্য এবং হিমবাহের গতির জন্য সৃষ্টি হয়। হিমবাহে নানা ধরণের ফাটল আছে। কোনোটা আড়াআড়ি, কোনোটা লম্বালম্বি। এই ফাটলের দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার বিভিন্ন রকম এবং গভীরতারও তারতম্য আছে। কোনোটা পাঁচ দশ ফুট আবার কোনোটা দু'চার শ' ফুট গভীর। কোনো ফাটলের অভ্যন্তরে জল আছে আবার কোনোটা শুষ্ক। অনেক ফাটলের নিচে প্রকোষ্ঠ দেখা যায়।

নতুন তুষার পড়লে হিমবাহের ফাটল অল্প বিস্তৃত ঢাকা পড়ে ফাঁসের মতো অপেক্ষা করে। নরম বরফের চাদরের ওপর পা পড়ামাত্র তা ভেঙ্গে যায় এবং অভিযাত্রীকে হিমবাহের অতলে আশ্রয় দেয়।

হিমবাহে চলার সময় লক্ষ্য করতে হবে আশেপাশে কোনো ফাটল আছে কিনা। নতুন বরফ হলে ফাটল দেখা যাবে না। সে অবস্থায় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

হিমবাহে চলার সময় অভিযাত্রীকে কোমরে বিলের দড়ি বেঁধে নিয়ে তুষার কুঠারের সাহায্যে বরফের অবস্থা বুঝে এগিয়ে যেতে হবে। শক্ত বরফে তুষার কুঠার দিয়ে আঘাত করলে ফাঁপা

অংশের ঢব্ ঢব্ শব্দ শোনা যাবে। এ শব্দের অর্থ নিচে ফাটল আছে। কিন্তু নরম বরফে তেমন কিছু বোঝা যায় না। সে অবস্থায় তুষার কুঠার বরফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে বুঝতে হবে ফাটল আছে কিনা।

পথ তৈরি হয়ে গেলেও হিমবাহে যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিত। হিমবাহ পার হবার সময় কোমরে দড়ির বিলে থাকা চাই। কখনোই একাকী হিমবাহ অতিক্রম করা উচিত নয়।

যদি কেউ ফাটলে পড়েই যায় তাহলে তাকে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। ফাটলে যদি জল না থাকে তাহলে রক্ষা, জল থাকলেই বিপদ বেশি। শুকনো ফাটল ভয়াবহ বটেই তবে তার অভ্যন্তরে অনেকক্ষণ অবস্থান করা যায়।

ফাটলের গহ্বর থেকে উদ্ধারকে পর্বতারোহণের পরিভাষায় বলে ক্রিভাস রেসকিউ।

ফাটলের গভীরতা কম হলে পড়ে যাওয়া সদস্য নিজেই উঠে আসার চেষ্টা করতে পারে। ফাটলের দেওয়াল যদি আরোহণ যোগ্য হয়, অর্থাৎ হোল্ডস্ এবং গ্রিপ থাকে তাহলে খাড়াই দেওয়াল আরোহণের প্রক্রিয়ায় ফাটলের বাইরে উঠে আসা যায়। ফাটলের বিস্তার যদি চিমনীর মতো হয় তাহলে ব্যাকিং আপ, ব্রিজিং অথবা স্ট্র্যাডলিং করে উঠে আসা যায়। এ অবস্থায় ফাটলের বর্হিমুখে বিলে করা সদস্য আইস এক্স বরফের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণাকুণি প্রবেশ করিয়ে নিজের কোমরের শ্লিংয়ের সঙ্গে এ্যাঙ্কার করে হিপ অথবা শোল্ডার বিলে করতে পারে।

পতনকারী সদস্য যদি আঘাতের কারণে অচৈতন্য হয়ে পড়ে তাহলে ক্রিভাস রেসকিউ করতে হবে ফাটলের বাইরে থেকে।

একজন সদস্যকে বিলে দড়ির সাহায্যে র‍্যাপেলিং করে নিচে নামতে হবে। নামার সময় তার সঙ্গে থাকবে কয়েকটি শ্লিং, ক্যারাবিনার, গরম পানীয় ও খাদ্য। ফাটলের অভ্যন্তরে অবতরণ করে দেখতে

হবে পতনকারী সদস্যের অবস্থা। আগে তাকে গরম পানীয় দিয়ে চাঙ্গা করে তারপর প্রুসিক নটের সাহায্যে পতনকারীর বিলে দড়িতে বেঁধে দিতে হবে। নিচ থেকে নির্দেশ পাঠালে ওপরের উদ্ধারকারী দল বিলে দড়ি টেনে পতনকারীকে ওপরে তুলে নেবে। আহত সদস্য ওপরে চলে যাবার পর উদ্ধারকারী সদস্য উঠে আসবে ফাটলের বাইরে। এ প্রক্রিয়ায় দুটো দড়ির সাহায্য নিতে হয়।

পাহাড়ের বিপদ-আপদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল শারীরিক বিপর্যয়। এক আবহাওয়ায় লালিত মানব দেহ অন্য আবহাওয়ায় সহজে বিগড়ে যায়। বিশেষ করে হিমালয়ের নানা উচ্চতায় নানারকম আবহাওয়া। দশ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত যেমন গরম তেমনই শীত। তারপর থেকে কেবল শীত আর শীত। ঠাণ্ডা লাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। জল থেকেও পেটের নানা অসুখ-বিসুখ হতে পারে। এ সবের বিরুদ্ধে অভিযাত্রীকে সাবধান হতে হবে।

জল ফুটিয়ে পান করা উচিত। না হলে অন্তত পরিষ্কার ঝরনার জল পান করা উচিত। ঝরনার জল পান করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ওপরে কোনো গ্রাম আছে কিনা। গ্রাম থাকলে জল নোংরা হবেই আর সেই জল পান করলে রোগ ঠেকায় কে।

পায়ে চলার সময় দেহে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয়। ফলে ঘাম ঝরে সারা গা বেয়ে। এ অবস্থায় বুকে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তাই যতই গরম হোক না কেন, হঠাৎ গরম পোশাক খুলে ফেলা উচিত নয়। টাওয়েল অথবা গামছা দিয়ে জামার মধ্য থেকে গায়ের ঘাম মুছে নিলে ভয় কম থাকে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে নিউমোনিয়া হতে পারে।

উচ্চতার সঙ্গে শরীরকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। দশ হাজার ফুট উঠে দু'এক দিন বিশ্রাম নিলে ওই উচ্চতায় দেহ স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর পনেরো ষোল হাজার ফুট উচ্চতায় আবার অবস্থান করতে হয়

আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য। এভাবে প্রতি তিন থেকে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় কিছুদিন থাকলে উচ্চতাজনিত রোগ এড়ানো যায়। একে পর্বতারোহণের পরিভাষায় বলে Acclimatisation বা আবহাওয়া মানিয়ে নেওয়া।

অতি উচ্চতাজনিত রোগের লক্ষণ মাথাধরা, ক্ষুধামান্দ, খিটখিটে স্বভাব, বমিভাব, অনিদ্রা, ভুলবকা ইত্যাদি।

এ রোগের একমাত্র প্রতিকার রোগীকে অতি-উচ্চতা থেকে তৎক্ষণাৎ অল্প উচ্চতার কোনো শিবিরে নামিয়ে দেওয়া। দেখা গেছে নিচের শিবিরে আসার পর বিনা ওষুধে রোগমুক্তি হয়েছে। নিউমোনিয়া অথবা পালমুনারি এডিমায় আক্রান্ত রোগীকে যথাযথ ওষুধ পত্র দিয়ে অতি দ্রুত নিচের সমতলে পাঠিয়ে দিতে হবে। তারপর নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

তুষারক্ষত এবং তুষারান্ধতা বড় মারাত্মক ব্যাধি। এতে মৃত্যু ভয় না থাকলেও অঙ্গহানির আশংকা ষোল আনা।

তুষারক্ষত (frost bite) দেহের নানা অঙ্গে হতে পারে। বিশেষ করে হাতের আঙুল এবং পাতায়, পায়ের আঙুল, গোড়ালী এবং পাতায় সহজেই তুষারক্ষত হয়। নাক এবং কানেও তুষারক্ষত হতে পারে। অর্থাৎ শরীরের যে অঙ্গে রক্ত চলাচলের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা থাকে সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রক্তবহা শিরা জমে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। গরমে যেমন ফোসকা পড়ে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও তেমন ফোসকা পড়ে। সেই ফোসকাই তুষারক্ষতে রূপান্তরিত হয়।

নরম বরফে আরোহণ অবরোহণের সময় জুতোর মধ্য দিয়ে বরফের কুচি পায়ে প্রবেশ করে মোজা ভিজিয়ে দেয়। ভিজে মোজার জমাট উত্তাপ কালক্রমে হ্রাস পেয়ে পায়ের উত্তাপকে হরণ করে। এর ফলে পায়ের আঙুল, পাতা এবং গোড়ালীর মধ্যে সূক্ষ্ম রক্তবহা শিরা-উপশিরা জমে যেতে থাকে এবং রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আক্রান্ত অঙ্গকে অসাড় করে দেয়। অসাড় অঙ্গে ধীরে ধীরে পচন

ধরে এবং শেষে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষত অংশ সময় মতো কেটে বাদ দিলে পচন রোধ হতে পারে।

তুষারক্ষত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তুষারে চলাকালীন বারবার মোজা পরীক্ষা করতে হবে। মোজা ভিজে গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে পালটিয়ে নিতে হবে। প্রত্যেকের সঙ্গে সেই কারণে বাড়তি মোজা রাখা উচিত। বিশ্রাম নেবার সময় জুতোর মধ্যে পায়ের আঙুল নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে রক্ত চলাচল নিয়মিত করতে পারে। আরোহণের জুতো পায়ের মাপের চেয়ে এ কারণেই সামান্য বড় নিতে হয়। চাপ জুতোর মধ্যে সহজেই পা জমে যায়, রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। অভিযানের সময় চিকিৎসকের নির্দেশ মতো নিয়মিত প্রিসকল ট্যাবলেট খেলে সম্ভাব্য তুষারক্ষতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

হাতে পশমের দস্তানার ওপর জল ও বায়ু নিরোধক দস্তানা পরলে হাতে ঠাণ্ডা লাগে না এবং তুষারক্ষত হতে পারে না। বিশ্রামের সময় পায়ের আঙুলের মতো হাতের মুঠো আলগা এবং শক্ত করার ব্যায়াম করলে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয় না। মাঝে মাঝে নাক এবং কান ম্যাসাজ করা উচিত। ম্যাসাজে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে।

তুষারান্ধতা (Snow blindness) আর একটি মারাত্মক ব্যাধি। শুভ্র তুষারে সূর্যের আলোর প্রতিফলন চোখের ওপর প্রচণ্ড ক্রিয়া করে। এর ফলে অন্ধত্ব রোগ দেখা দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ রোগ সাময়িক। নিয়মিত বিশ্রাম আর চিকিৎসা চালালে রোগ সেরে যায়। তুষারান্ধতা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বরফে চলার সময় রঙিন চশমা ব্যবহার করতে হবে। চশমা হবে কমলা রঙের অথবা হলুদ বর্ণ। একটা অতিরিক্ত চশমা থাকা উচিত। একটা ভাঙলে অথবা হারিয়ে গেলে যাতে অপরটা ব্যবহার করা যায়।

পাহাড়ে যেমন বিপদ আছে তেমনই সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবার

সম্ভাব্য উপায়ও আছে। পর্বতারোহী, শৈলারোহী অথবা ভ্রমণকারীরা যদি পাহাড়ে চলার নিয়ম কানুন ঠিক ঠিক মেনে চলে তাহলে যে কোনো বিপদে তারা অবিচলিত থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে বার করতে পারে সহজে।

হিমালয় অনভিজ্ঞের তো বটেই এমন কি অভিজ্ঞের ভুলের মাশুল ষোল আনা গুণে নেয়। বিখ্যাত পর্বতারোহী স্মাইথ বলেছেন, "there are peaks of all heights and shades of difficulty in the Himalayas where the novice may learn the craft. Nature is intolerant of ignorance, and he who attempts the greater peaks of the Himalayas without having acquired the delicacy and acuteness of perception, that instinctive feeling for his task, will sooner or later blunder to disaster."

॥ তেরো ॥

পোষাক-পরিচ্ছদ

পাহাড়ে ভ্রমণের সঙ্গে পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য এবং বাসস্থানের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পোষাক এবং সাজ-সরঞ্জামের কথা আগের অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের পনেরো-ষোল হাজার ফুট উচ্চতায় ভ্রমণ করার জন্য নিম্নলিখিত পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সাজ-সরঞ্জাম নেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে মালপত্র যত কম হবে ততই সুবিধা। আজকাল মালবাহকদের দৈনিক মজুরী পনেরো থেকে বিশ টাকা। দশ পনেরো দিনের ভ্রমণসূচীতে মালবাহকদের খরচ যোগাতে ফতুর হয়ে যেতে হবে। মালের ওজন কম হলে নিজেই নিজের মাল পিঠে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এতে অর্থের সাশ্রয় তো হয়ই, ভ্রমণের স্বাধীনতা ও আনন্দ পুরো বজায় থাকে।

একজন ভ্রমণকারীর জন্য প্রয়োজন—একটি হালকা রুকস্যাক অথবা হ্যাভারস্যাক, একজোড়া ফুলপ্যান্ট ও সার্ট, একজোড়া গেঞ্জি এবং আণ্ডার-অয়ার, একটি করে হাফ ও ফুল সোয়েটার, দু-জোড়া করে পশম ও নাইলনের মোজা, একটি হানটার জুতো, টুপি এবং রঙিন চশমা। একটি জলের বোতল, একটি ফ্লাস্ক (দু'তিন জনের জন্য), সেভিং সেট, সাবান, তোয়ালে অথবা গামছা, দাঁত মাজার পেষ্ট ও ব্রাশ, চিরুনি, টর্চ ও ছোট ছুরি, একটি পাঁচ/ছয় ফুট লম্বা লাঠি অথবা আইস এ্যাক্স। বিছানা হিসাবে একটি শ্লিপিং ব্যাগ ও এয়ার ম্যাট্রেস, পরিবর্তে দুটো কম্বল হলেও চলে। একটা ৮ ফুট লম্বা এবং ৪ ফুট চওড়া পলিথিন সিট এবং একটা ওয়াটার প্রুফ নেওয়া চাই। অন্তত একটা ৫০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ½ ইঞ্চি পরিধির দড়ি থাকা চাই।

খাদ্যদ্রব্য

পাহাড়ে কি খাব এ এক মস্ত প্রশ্ন এবং চিরায়ত সমস্যা। দেশী বিদেশী ভ্রমণকারী এবং পর্বতারোহীরা খাদ্য সমস্যা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছেন। দুর্গম কঠিন পথের ধকল সহ্য করার মতো খাদ্য চাই। যারা সব রকম খাবারেই অভ্যস্ত তাদের জন্য চিন্তার কিছু নেই। হিমালয়ের মানুষ যে খাদ্য খেয়ে বেঁচে আছে সেই খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস যাদের আছে তাদের ভাল ভাবেই চলে যাবে। যাদের খাদ্যাভ্যাস আলাদা, তাদের সমতল থেকে রুচি মাফিক খাবার জোগাড়যন্ত্র করে নিয়ে যেতে হবে।

টিনের খাদ্য এত মূল্যবান যে তা আমাদের বেশির ভাগের নাগালের বাইরে। তাই প্রত্যহ যে খাদ্য আমরা খাই তা নিতে হবে সঙ্গে। ভাত রুটি ডাল আর সবজির সঙ্গে দু'এক টুকরো মাংস অথবা ডিম হলেই মোটামুটি ভাল আহার হয়। এর সঙ্গে চা কফি হরলিকস্ ওভালটিন থাকতেই হবে। পাহাড়ে যে যত জলীয় খাদ্য খেতে পারে তার শরীর তত ভাল থাকে। গ্লুকোজ অথবা গ্ল্যাকসোজ-ডি এবং চিনি প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করতে হয় দেহের উত্তাপ বজায় রাখার জন্য। এ ছাড়া বিস্কুট, টফি, চকোলেট, কাজু-কিসমিস, আমসত্ব ইত্যাদি দিয়ে দেহের পুষ্টিসাধন করা যেতে পারে।

পদযাত্রার সময় ভাল প্রাতঃরাশ করা উচিত। সকালে যদি পথে রান্নার অসুবিধা থাকে তাহলে দ্বিপ্রাহরিক আহার তৈরি করে সঙ্গে নিতে হবে। সময় মতো আহার না করলে অচিরে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হবে। সঙ্গে চা-কফি অথবা অন্য পানীয় নেওয়া উচিত। পথে প্রচুর জল পান করা উচিত। জল পান করার আগে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে। পরিষ্কার ঝরনার জল পান করা উচিত। নদীর জল অধিকাংশ সময় অপরিষ্কার হয়। আশেপাশে লোকালয় থাকলে সাবধানে জলপান করতে হবে। গ্রামের মানুষ অনেকে ঝরনায় কাপড় কাচা ইত্যাদি কাজ করে বলে জল দূষিত হতে পারে। জলে

কিছুটা ফটকিরি অথবা হ্যালুজিন ট্যাবলেট দিয়ে নিলে জল বিশুদ্ধ হয়।

দিনের বেলায় হাল্কা খাবার এবং রাতে ভাত ডাল ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। সারাদিন পরিশ্রমের পর ভাত ভালই লাগবে। ডাল-চালের খিচুড়ি সহজ পাচ্য এবং উপাদেয় খাদ্য।

ভ্রমণের সময় মাদকদ্রব্য পান করা একেবারেই অনুচিত। অনেকের ধারণা ঠাণ্ডায় মদ্যজাতীয় পানীয় শরীরের জন্য প্রয়োজন। এ ধারণা একেবারেই ভুল। মদ্যজাতীয় পানীয় শরীরের উত্তাপ সাময়িক ভাবে বাড়ায় বটে, কিন্তু তারপরই চটপট দেহের উত্তাপ নেমে যায়, ফলে কাঁপুনী ধরে। পরদিন অবশ্যম্ভাবীরূপে শরীরের শক্তি অর্ধেকের বেশি ক্ষয় করে দেয়। বিশেষ প্রয়োজনে চিকিৎসকের নির্দেশে এক আধ আউন্স 'ডকটর্স ব্র্যাণ্ডি' পান করা চলে। নিয়মিত ব্র্যাণ্ডি পান করলে কিন্তু শরীরের উত্তাপ ক্ষয় হবেই।

খাদ্য তৈরি করার সময় তেল ঘি ঝালমশলা সামান্য ব্যবহার করা উচিত। সহজ পাচ্য খাদ্যই খাওয়া উচিত। কারণ একবার অসুস্থ হলে ভ্রমণের আনন্দ শেষ হয়ে যাবে। অনেক সময় দুর্গম পথে অসুস্থ শরীর বিপদ ডেকে আনতে পারে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে প্রতিটি ভ্রমণকারীর সাবধান হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

বাসস্থান বা ক্যাম্পিং (Camping)

ভ্রমণকারীর খাদ্য এবং পোষাক-পরিচ্ছদের মতোই বাসস্থান অর্থাৎ সারাদিন হাঁটার পর বিশ্রামের জন্য মাথা গোঁজার জায়গা দরকার। রাতে একটু আরামদায়ক বিশ্রামগৃহ না পাওয়া গেলে পরের দিনের কঠিন পথের দৈহিক সামর্থ সংগ্রহ করা মুশকিল।

পরিচিত তীর্থপথে চটি এবং ধর্মশালা পাওয়া যায়। উত্তর

প্রদেশের টুরিস্ট বিভাগ কেদার-বদরীর পথে কয়েকটি বিশ্রামগৃহ নির্মাণ করেছেন। খাট বিছানা সবই পাওয়া যায় সেখানে। মাথাপিছু অথবা ঘরপিছু ভাড়ায় আরামে থাকা যায়। বন বিভাগের কিছু বাংলো আছে হিমালয়ের নানা প্রান্তে, যেখানে রাত কাটাবার সুবন্দোবস্ত আছে। পিণ্ডারী হিমবাহের পথে আট-দশ মাইল অন্তর সুন্দর ডাকবাংলো আছে, যেখানে আরামে রাত কাটানো যায়। রূপ-কুণ্ডের পথে ওয়ান গ্রাম পর্যন্ত সরকারী ডাকবাংলো আছে। তারপর কেবল আলিবুগিয়াল ছাড়া আর কোনো জায়গায় ডাকবাংলো অথবা চটি নেই। তবে কিছু গুহা এবং ভেড়া-বকরীওয়ালাদের ছাউনি আছে, যেখানে ভাল ভাবেই রাত কাটানো যায়। সুন্দরডুঙ্গার পথে কেবল ডুঙ্গিয়াঢণ্ডেই যা ছোট দু'একটি গুহা আছে, কিন্তু সুন্দরডুঙ্গায় পৌঁছলে বড় বড় তিনটে রাখালের কুটির পাওয়া যায়। আরো এগিয়ে সুকরাম অঞ্চলে বিরাট এক ওভারহ্যাং রক্ আছে যেখানে বিশ-তিরিশ জন আরামে রাত কাটাতে পারে ওভারহ্যাং গুহার নিচে।

কিন্তু যেখানে থাকার কোনো ব্যবস্থাই নেই সেখানে মাথা গোঁজার বন্দোবস্ত করতে হয়। এই ব্যবস্থাকে বলে ক্যাম্পিং।

ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ইউথ হোস্টেল থাকা সত্বেও সেদেশের তরুণরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে থেকে আনন্দ আহরণের উদ্দেশ্যে খোলা আকাশের নিচে বাস করা পছন্দ করে। এতে যেমন স্বাধীনতা থাকে তেমনই নানা বিপদ আপদ এবং অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরিয়ে নেওয়া যায়।

ওদেশের মতো আমাদের ভ্রমণকারীর জন্য হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে ইউথ হোস্টেল তো নেই-ই এমনকি বাস করার মতো কোনো আশ্রয়ও তৈরি হয়নি। প্রতি বছর শত শত তরুণ যে অঞ্চলে ভ্রমণ করছে নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে, সেখানে সে অঞ্চলের সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সরকার চোখ বুজে বসে থাকলে তো আর পদযাত্রী

বসে থাকতে পারে না। পথের ডাকে তাকে বেরিয়ে পড়তেই হবে। এবং বেরুবার আগে সম্ভাব্য অসুবিধাগুলি যাতে সুচারুরূপে এড়িয়ে নিজের আরামের ব্যবস্থা করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রচলিত তীর্থপথ ছাড়া যারা হিমালয়ের গহন কন্দরে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হবে তাদের ক্যাম্পিং-এর সব ব্যবস্থা থাকা চাই। ক্যাম্পিং-এর প্রথম কথা হল স্থান নির্বাচন।

শিবিরের স্থান নির্বাচন করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নজরে রাখতে হবে।

ক) জায়গাটা হবে খোলামেলা। কিন্তু ঝড় উঠলে যাতে তাঁবুর ক্ষতি না করতে পারে এমন জায়গা হওয়া চাই। কোনো বড় পাথরের আড়ালে অথবা নিচু জমিতে শিবির স্থাপন করা যেতে পারে।

খ) কোণাকুণি খাড়াই জমিতে তাঁবু পাতা চলবে না। জমি সমতল হওয়া চাই। অন্তত তাঁবুর অংশটি সমতল হলেই চলবে। অসমতল জমিতে আরামে বিশ্রাম করা অসম্ভব। যেখানে নড়বড়ে পাথর থাকবে সেখানেও শিবির স্থাপন করা চলবে না। পাথর গড়ালে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

গ) নদীর তীরে অথবা গ্রামের মধ্যে শিবির স্থাপন করা চলবে না। পাহাড়ী নদীতে হঠাৎ হঠাৎ ঢল নামে এবং দু'কুল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নদীর তীরে ক্যাম্প করা তাই বিপজ্জনক। তেমনই গ্রামের অভ্যন্তরে শিবির স্থাপন করা উচিত নয়। এতে নানা রকম সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করতে পারে ভ্রমণকারীদের। নদীর তীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে ক্যাম্প করা যেতে পারে। তেমনই গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে সমতল জমিতে ক্যাম্প করা উচিত।

ঘ) ক্যাম্পের সবচেয়ে ভাল জায়গা হল, যেখানে সরাসরি হাওয়ার দাপট নেই, যেখানে প্রচুর পরিমাণে জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায় এবং যেখানে কাছাকাছি বিশুদ্ধ জলের ধারা আছে।

শিবির স্থাপন করার আগে মনোনীত জমির মালিকের অনুমতি নেওয়া উচিত এবং জমি ব্যবহার করার জন্য কিছু ভাড়া দেওয়া উচিত। অবশ্য এক রাতের জন্য হয়ত কেউই ভ্রমণকারীর কাছ থেকে ভাড়া নিতে চাইবেন না। এতে জমির মালিকের সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যাবে। গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুললে তাদের কাছ থেকেও বহুবিধ সাহায্য পাওয়া যাবে।

শিবির থেকে অন্তত একশ' গজ দূরে শৌচাগার বানাতে হবে। আস্তাকুড় করার জন্য বড় একটা গর্ত বানিয়ে তাতে অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ফেলতে হবে। শিবির তুলে নেবার সময় শৌচাগারের গর্ত এবং আস্তাকুড়ের গর্ত মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিতে হবে। শিবিরের আশপাশ নোংরা করা উচিত নয়, কারণ অন্য দল সেখানে শিবির স্থাপন করতে পারে। শিবির পরিত্যাগ করার সময় সেই স্থানটি পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত।

জলধারার কাছে কখনো শৌচ কাজ করা উচিত নয়। এতে জলের বিশুদ্ধতা নষ্ট হতে পারে এবং সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে।

শিবির পরিত্যাগের সময় উনুনের আগুন নিভিয়ে দিতে হবে। জ্বালানী কাঠ গুছিয়ে রেখে দিলে পরবর্তী দল তা ব্যবহার করতে পারে।

কোনো শিবির যদি একাধিক দিন রাখার প্রয়োজন হয় তাহলে শিবিরের চারদিকে পাথর সাজিয়ে দেওয়াল বানানো যেতে পারে। এ দেওয়াল এক অথবা দু'ফুট উঁচু হলেই হবে। তাছাড়া তাঁবুর চারধারে নর্দমা বানিয়ে নিতে হবে। এই নর্দমা দিয়ে বৃষ্টির জল প্রবাহিত হলে তাঁবুর ক্ষতি হবে না এবং সাপখোপ তাঁবুতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাঁবুর খোঁটা এবং বাইরের কাপড়ের ওপর মাঝারী আকারের পাথর চাপিয়ে দিলে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

শিবিরের স্থান নির্বাচন এবং শিবির স্থাপনের পর শিবিরের সাজ-

সরঞ্জামের প্রয়োজন। সেগুলি হল, তাঁবু, বিছানাপত্র, রান্নার সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি।

তাঁবু নেবার সময় দেখতে হবে যাতে তাঁবুটির ওজন কম হয় এবং ছেঁড়া ফাটা না থাকে। নাইলন অথবা টেরিলিনের তাঁবু সবচেয়ে ভাল। এর ওজন কম এবং মজবুত। দুজন সদস্য থাকার মতো টু-মেন টেণ্ট-এর ওজন দশ বারো পাউণ্ড। এটি ইংরেজী 'A' আকৃতির হলে সবচেয়ে ভাল হয়। এই তাঁবুর মধ্যে দুটি বিছানা এবং রান্না করার মতো জায়গা পাওয়া যায়। অবশ্য ষ্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করতে হবে।

বড় দল হলে মেস টেণ্ট নেওয়া যায়। তবে এর ওজন প্রায় আধমণ। আট-দশজন আরামে থাকতে পারে। হাল্কা টু-মেন টেণ্ট নেওয়াই ভাল। প্রয়োজনে সদস্যরা ভাগাভাগি করে এ তাঁবু বহন করতে পারে।

তাঁবুর সঙ্গে ওই মাপের একটা করে পলিথিন সিট রাখতে হবে। বৃষ্টি হলে নাইলন অথবা টেরিলিনের তাঁবুতে জল প্রবেশ করে বিশ্রামের আনন্দ নষ্ট করে দেয়। পলিথিনের চাদর তাঁবুর ওপর বিছিয়ে নিলে জল প্রবেশের আশংকা থাকে না।

তাঁবু লাগাবার জন্য লোহা অথবা এ্যালুমিনিয়ামের পেগ লাগে। তাঁবুর সঙ্গে এগুলোও পাওয়া যায়। পেগ অর্থাৎ কাঁটা। এই পেগ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব। তাই কিছু অতিরিক্ত পেগ সঙ্গে রাখা দরকার। কিছু অতিরিক্ত তাঁবুর দড়িও রাখতে হয়। প্রয়োজনের কথা তো আর বলা যায় না।

তাঁবু খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। যেমন—

ক) তাঁবু লাগাবার সময় জমি সাফ করে নিতে হবে, কোনো পাথর ইত্যাদি নিচে থাকলে গ্রাউণ্ড সিট কেটে যেতে পারে।

খ) তাঁবু তোলার সময় আগে পেগগুলো অপসারণ করে সযত্নে রাখতে হবে—ওগুলো সহজে হারিয়ে যাবার আশংকা থাকে।

তাঁবুর যে কাপড় জমিতে পাতা থাকে তা মাটির সঙ্গে জমে যেতে পারে তাই তাঁবু তোলার সময় সাবধানে তুলতে হবে, না হলে মাটির সঙ্গে কামড়ে থাকা অংশ ছিঁড়ে যেতে পারে।

গ) তাঁবুর মধ্যে মোমবাতি কিংবা ষ্টোভ জ্বালালে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। আগুন লাগার আশংকা থাকে।

ঘ) তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করার আগে বাইরে জুতো খুলে রাখতে হবে, নাহলে তাঁবু অপরিষ্কার হয়ে যাবে এবং তাড়াতাড়ি তাঁবুর কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে।

ঙ) ভিজে তাঁবু শুকিয়ে নিয়ে তবেই তোলা উচিত, অন্যথায় কাপড় পচে যেতে পারে। ভ্রমণ শেষে তাঁবু কেচে তুলে রাখলে আয়ুবৃদ্ধি হয়।

বিছানাপত্র—সামর্থ অনুযায়ী বিছানার ব্যবহার হয়। যার পক্ষে স্লিপিং ব্যাগ এবং এয়ার ম্যাট্রেস নেওয়া সম্ভব নয় তাকে কম্বল নিয়েই যেতে হবে। স্লিপিং ব্যাগ ও এয়ার ম্যাট্রেসের আলোচনা আগেই করেছি। একটা টু-মেন টেণ্টে দুটো এয়ার ম্যাট্রেস এবং স্লিপিং ব্যাগ বিছনো যায়। পরিবর্তে নিচে দু'খানা কম্বল ডবল করে পেতে এবং একখানা করে কম্বল গায়ে দিলেও আরাম পাওয়া যায়।

রান্নার সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে দরকার ষ্টোভ, কেরোসিন তেল এবং বাসনকোসন।

পাহাড়ে প্রেসার ষ্টোভ খুবই উপযোগী। প্রাইমাস ষ্টোভ সবচেয়ে ভাল। অন্যথায় যে কোনো নামকরা কোম্পানীর ভাল ষ্টোভ নেওয়া উচিত। কেরোসিন ষ্টোভ পাম্প করার সময় সাবধান হতে হবে। প্রেসার ষ্টোভের পরিবর্তে জনতা ষ্টোভ দিয়েও কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। তবে এতে উত্তাপ কম হয় এবং রান্না করতে সময় বেশি লাগে

ষ্টোভের বাড়তি পার্টস রাখতে হয়। বিশেষ করে ষ্টোভ পিন বাড়তি রাখা উচিত। প্রতিটি সদস্যের ষ্টোভ মেরামতীর কাজ জানা চাই। যাতে অচল ষ্টোভ প্রয়োজনে যে কেউ সারিয়ে নিতে

প্যারে চটপট। যেখানে জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায় না সেখানে স্টোভ ব্যবহার করতেই হবে।

কেরোসিন তেল পলিথিনের জারে নিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক। পলিথিনের জার যেমন ওজনে হাল্কা, তেমনই পরিবহনের পক্ষে আদর্শ। বিভিন্ন মাপের পলিথিন জেরিক্যান এখন সারা দেশেই তৈরি হয়।

কেরোসিন তেল এবং স্টোভের পার্টস শহর অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে। দুর্গম পার্বত্য গ্রামে ওসব পাওয়া দুষ্কর।

বাসনপত্র যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি নেওয়া উচিত নয়। স্টীল অথবা এ্যালুমিনিয়ামের বাসন হাল্কা। এগুলো নেওয়ার সুবিধাও অনেক। অল্প পরিশ্রমে পরিষ্কার করা যায়।

বাসনের মধ্যে ডেকচি, ফ্রাই প্যান, প্যান, হাতা, খুন্তি এবং রুটি বানাবার চাটু ইত্যাদি খুবই প্রয়োজনীয়। কেতলির কাজ প্যান দিয়ে সারা যায়। দল বড় হলে কেতলির দরকার। এসব ছাড়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হল প্রেসার কুকার। তাড়াতাড়ি রান্না করার জন্য প্রেসার কুকারের জুড়ি নেই। যেমন সদস্য সংখ্যা তেমন মাপের প্রেসার কুকার নিলে অন্য বাসনের কাজও দেয়। প্রেসার কুকারের বাড়তি পার্টস রাখতে হবে। বাসনকোসন ছাড়া প্রতিটি সদস্যের জন্য কলায়ের থালা, মগ এবং চামচ নিতে হবে।

ক্যাম্পের সাজ-সরঞ্জাম এবং বাসনকোসন নেবার সময় বিশেষ সাবধানে হিসেব করে নিতে হবে। কোনো প্রয়োজনীয় মালপত্র যেন বাদ না পড়ে। যে মালপত্র নেওয়া হবে তার ওজন যতটা সম্ভব কম হওয়া দরকার। ঠিক মতো হিসাব করে নিলে ওজন কমের দিকেই থাকে।

রান্নাঘরের দায়িত্ব একজন অভিজ্ঞ সদস্যের হাতে দিতে হবে। তার পদবী হবে কোয়ার্টার মাষ্টার। সদস্যের রুচি এবং স্বাস্থ্যের দিকে তার নজর থাকবে প্রখর।

আমার মনে হয় প্রতিটি সদস্য যদি নিজেরাই রান্নার দায়িত্ব নেয় তাহলে খাদ্যের স্বাদ হবে অমৃত তুল্য। বনভোজনের রান্নার স্বাদ আমাদের সবারই যখন ভাল লাগে, তখন ভ্রমণের সময় রান্না বনভোজনের মেজাজে করলে সে স্বাদই পাওয়া যাবে।

পাহাড় পাহাড় খেলায় আমরা প্রাত্যহিক জীবনের অনেক কাজ নিজের হাতে করে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি।

প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid)

হিমালয় ভ্রমণ এবং অভিযানে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত রাখা উচিত। সাধারণ ভ্রমণকারীর প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান অবশ্যই থাকা দরকার। নিজে অসুস্থ হলে যাতে নিজের চিকিৎসা নিজেই করে নিতে পারে সে রকম সাধারণ ওষুধপত্রের জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

হিমালয়ের অধিকাংশ অঞ্চল আজও সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত। সেখানে ডাক্তার-বৈদ্য নেই, নেই চিকিৎসার ব্যবস্থা অথবা ওষুধপত্র। সাধারণ মানুষ চিকিৎসার পরিবর্তে নিজের অদৃষ্টকে বিশ্বাস করে বেশি। খুব বিপদে পড়লে তবেই ওরা ওঝা এবং ঝাড়-ফুঁকওয়ালার শরণাপন্ন হয়।

তাই হিমালয়ের দুর্গমে ভ্রমণ করতে হলে সাধারণ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া উচিত।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য একটি 'ফার্ষ্ট-এড বক্স' রাখতে হবে। ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা জয়ার কোম্পানী (Joyer Company) নানা আকারের ফার্ষ্ট-এড বক্স প্রস্তুত করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। এগুলি যেমন সহজেই বহন করা যায় তেমন এর দামও সামান্য।

ফার্ষ্ট-এড বক্সে থাকে তুলো, ব্যাণ্ডেজ, গজ, আয়োডিন, বেনজিন,

বার্ণল, স্মেলিং সল্ট, এ্যাডেসিভ প্লাষ্টার, লিন্ট, রবার ব্যাণ্ডেজ, টুর্নি-কেট, ট্রায়াঙ্গুলার ব্যাণ্ডেজ, ছুরি, কাচি, ফরসেপ ইত্যাদি। এ ছাড়া থাকে ডেটল জাতীয় ওষুধ। ছোটখাটো আঘাত এবং ঘা ইত্যাদ্দির প্রাথমিক চিকিৎসা করা চলে।

জ্বর, মাথাধরা, পেটের অসুখ, সর্দ্দিকাশি এবং এ ধরণের ছোট-খাটো অসুস্থতার ট্যাবলেট রাখা দরকার। অম্ল-বায়ুনাশক ওষুধও রাখতে হবে যেমন, তেমনই পারগেটিভ রাখা প্রয়োজন।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের লিষ্ট কোনো ডাক্তারকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নেওয়া সবচেয়ে ভাল। ওষুধের জ্ঞান না থাকলেও পেটেন্ট ওষুধের কার্যকারিতা লিখে নিয়ে গেলেও প্রয়োজমে কাজে লাগে। আর সঙ্গে যদি একজন ডাক্তার সদস্য পাওয়া যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

কোনো সদস্য প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ না হলে তাকে তাড়া-তাড়ি নিচে নামিয়ে আনতে হবে এবং নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

অনেক সময় অতি-উচ্চতাজনিত অসুখ (high altitude sickness) নিচে নেমে এলে ভাল হয়ে যায়। ডাক্তার ছাড়া অসুস্থতার কারণ জানা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই অপেক্ষা না করেই হাসপাতালে অথবা ডাক্তারের কাছে অসুস্থ সদস্যকে নিয়ে আসতে হবে।

প্রতিটি ভ্রমণকারী এবং পর্বতারোহীর ফার্ষ্ট-এড ট্রেনিং নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ করে পর্বতারোহণে আঘাত লাগার আশংকা থাকে প্রতি মুহূর্তে। আহত সদস্যের আঘাতের স্থানে চটপট প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ব্যাণ্ডেজ করতে হয়। সুতরাং ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাজটা শিখে নেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়। ফার্ষ্ট-এড শিক্ষা নেওয়া থাকলে সহজেই নিজের সঙ্গীকে আরাম তো দেওয়া যায়ই, প্রাণেও বাঁচান যায়।

অভিযাত্রী দলে সম্পূর্ণ মেডিক্যাল ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক মেডিক্যালের পুরো দায়িত্বে থাকবেন। প্রয়োজনীয় সব রকম ওষুধপত্র রাখতে হবে। সার্জিক্যাল ব্যবস্থাও রাখতে হবে। অপারেশন অনেক সময় জরুরী হয়ে পড়ে বলে অভিযানের ডাক্তার একজন শল্য চিকিৎসক হলেই ভাল হয়।

অভিযানে যেমন শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হয় তেমনই রাখতে হয় নিউমোনিয়া এবং তুষারক্ষতের ওষুধপত্র। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এবং বরফে চলাফেরার জন্য নিউমোনিয়া এবং তুষার-ক্ষত বা 'ফ্রস্ট বাইট' হবার আশংকা থাকে। এ দুই রোগ খুবই মারাত্মক এবং এর প্রতিকারের সম্ভাব্য সব চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকা একান্ত উচিত।

দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধার (Rescue Operation)

পর্বত অভিযানে বিপদ-আপদ এবং দুর্যোগ পদে পদে ঘটে। বিপদের সম্ভাবনা থাকে বলেই তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করতে হয় পর্বতারোহীদের।

হিমালয়ের সম্ভাব্য বিপদ আসে পাথর গড়িয়ে। যাকে পরিভাষায় বলে রক্ ফল (Rock fall) এবং আভাল্যান্শ্ (Avalanche) অর্থাৎ হিমানী-সম্প্রপাত থেকে। এ ছাড়া আছে ঝড়-তুফান, কঠিন পর্বতগাত্র থেকে পা পিছলে আছাড় খাওয়া, হিমবাহ ফাটল বা ক্রিভ্যাস্-এর (Crevasse) মধ্যে পড়ে যাওয়ার বিপদ ইত্যাদি।

এ ধরণের বিপদে পড়ে আহত হলে তাকে উদ্ধার করে আনাকে পর্বতারোহণের পরিভাষায় 'মাউন্টেন রেসকিউ অপারেশন' (Mountain Rescue Operation) বলে।

ইওরোপের নানাদেশে পর্বতারোহণ এবং শৈলারোহণ ক্রীড়া লোকপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনার সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

দুর্ঘটনায় আহত অভিযাত্রীকে উদ্ধার করে আনার জন্য উদ্ধারকারী সংস্থা গঠিত হয়েছে। সেই সংস্থায় শিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ উদ্ধারকারীরা আছেন। খবর পাওয়া মাত্র তাঁরা ছুটে যান দুর্ঘটনার স্থানে। প্রয়োজনে বিমান হেলিকপ্টাব মোটর সব কিছুই ব্যবহার করা হয় উদ্ধারকার্য চালানোর জন্য।

আমাদের দেশ এখনো সে পর্যায়ে পৌছয়নি। অবশ্য দুর্ঘটনা ঘটলে ভারতীয় পর্বতারোহণ সংস্থা (Indian Mountaineering Foundation), নতুন দিল্লী, সেনা দফ্‌তরের সাহায্যে উদ্ধার কার্য চালিয়েছেন, এ নজিরও আছে। আমাদেব দেশে দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধারের ব্যাপক কোনো ব্যবস্থা নেই অথবা উদ্ধারকারী সংস্থা এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্ধারকারী দলও নেই। তাই পাহাড়ে পর্বতে দুর্ঘটনা ঘটলে উদ্ধাবেব ব্যবস্থা নিজেদেবই করতে হবে।

উদ্ধারকার্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

দুর্ঘটনা ঘটলে অথবা দুর্ঘটনার সংবাদ এলে সর্বপ্রথম উদ্ধাবকারী দল' সংগঠন করতে হবে। উদ্ধাবকাবী দলেব সদস্যদেব মানসিক স্থৈর্য খুবই দৃঢ় হওয়া চাই, তবেই এ কঠিন কাজ তাদেব দ্বাবা সম্ভব হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসার সাজ-সবঞ্জাম একটা রুকস্যাকে ভরে নিতে হবে। ওষুধপত্র ছাড়াও কিছু খাবাব এবং গরম পানীয় ফ্লাস্কে ভরে নিতে হবে। প্রতিটি উদ্ধাবকাবীর সঙ্গে ক্লাইম্বিং রোপ, স্লিং, ক্যারাবিনার, আইস এক্স এবং দস্তানা বাখা উচিত। দুর্ঘটনাব স্থান থেকে উদ্ধার কবাব জন্য এগুলির প্রয়োজন হতে পারে। এ ছাড়া থাকবে কযেকটি স্লিপিং ব্যাগ, ফেদার কোট, টর্চ এবং হুইসিল ইত্যাদি।

উদ্ধাবকারী দল সংগঠন করে নিতে হবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে। দেরি হলে দুর্ঘটনায় আহত সদস্যের প্রাণহানী হতে পারে। এ কাজগুলি দলনেতাকে ঠাণ্ডা মাথায় কিন্তু বিদ্যুৎ গতিতে করতে হবে।

দুর্ঘটনার স্থানে পৌছবার পর দেখতে হবে আহতদের অবস্থা কেমন। পর্যবেক্ষণের পর যদি দেখা যায় উদ্ধারকারী দলই আহতদের নিচের শিবিরে নিয়ে আসতে সক্ষম তাহলে ওয়াকি টকি অথবা অয়ারলেস যন্ত্রে মূল শিবিরে সংবাদ পাঠাতে হবে। বার্তাপ্রেরক যন্ত্র না থাকলে রানার মারফৎ সংবাদ 'জরুরী' মার্কা দিয়ে নিচের শিবিরে পাঠাতে হবে। প্রয়োজনে নিচের শিবির 'এস ও এস' পাঠাবে নিকটবর্তী পুলিশ চৌকি অথবা মিলিটারী পোষ্টে। পুলিশ বা মিলিটারী 'এস ও এস' পেলে সব রকম সাহায্য নিয়ে ছুটে আসবে। অতীতে তাঁরা এমন বহু উদ্ধারকার্য করেছেন।

এরপর আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে গরম পানীয় পান করিয়ে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। তারপর তাদের নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

নামিয়ে আনার জন্য স্ট্রেচার সবচেয়ে উপযোগী। মাউন্টেন রেসকিউ স্ট্রেচার একটু বিশেষ ধরণের হয়। আমাদের দেশে তা পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে দড়ি দিয়ে পিগট রোপ স্ট্রেচার বানিয়ে নেওয়া যায়। স্ট্রেচার বানানোর অসুবিধা থাকলে ক্লাইমিং রোপ দিয়ে চেয়ার বানানো যায় এবং সেই চেয়ারে আহত সদস্যকে পিঠে করে নামিয়ে আনা যায়।

অভিযান অথবা ভ্রমণ সংগঠন করার আগে উদ্ধারকার্য সম্বন্ধে প্রতিটি সদস্যকে সম্যক জ্ঞান আহরণ করতে হবে। যাতে সত্যি-কারের বিপদের সময় তাদের মানসিক স্থৈর্য যথাযথ থাকে এবং চটপট উদ্ধারকার্য সমাধা করতে পারে।

ভ্রমণ এবং অভিযানের স্থান কাল এবং সদস্যদের পরিচয় লিপি স্থানীয় পুলিশ এবং মিলিটারী বেসের অফিসারদের কাছে রেখে যাওয়া উচিত। বিপদ ঘটলে ওখানে সংবাদ পাঠাতে পারলে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। পর্বত অভিযান হলে ভারতীয় পর্বতারোহণ সংস্থা, কেয়ার অব/মিনিস্ট্রী অব ডিফেন্স, নতুন দিল্লীতে সব সংবাদই

আগেভাগে দিয়ে রাখতে হয়। দুর্ঘটনা ঘটলে ওঁরা উদ্ধারকার্য পরিচালনা করেন।

পাহাড় পাহাড় খেলায় যেমন বিপদের আশংকা আছে তেমন আছে রোমাঞ্চের খোরাক। একবার যে রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়েছে তার কাছে মৃত্যুও পায়ের ভৃত্য। আমাদের দেশের শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে যেদিন এ খেলা ছড়িয়ে পড়বে ঘরে ঘরে সেদিন আর ইওরোপের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে না আমাদের। বিগত চোদ্দ-পনেরো বছরে পশ্চিমবঙ্গের যুবমানস যে হারে পাহাড় পাহাড় খেলায় মেতেছে তাতে আর সেই শুভ দিনের খুব দেরি নেই।

শৈলারোহণ সম্পর্কিত পরিভাষা

অ্যারেইট্ (**Arête**)—খাড়াই শৈলশিরা।

এ্যাবসেল বা র‍্যাপেল (**Abseil or Rappel**)—উঁচু শৈলপ্রাচীর অথবা বরফের দেওয়াল থেকে একজোড়া দড়ির সাহায্যে পাথর অথবা গাছে এ্যাঙ্কার করে দ্রুত অবতরণ।

এ্যাঙ্কার (**Anchor**)—পর্বতগাত্রের পাথরের খোঁচ অথবা স্পাইক অথবা শিলাগাত্র থেকে বেরিয়ে আসা কোনো পাথুরে অংশ অথবা গাছের ডাল যার সঙ্গে দড়ি অথবা স্লিং দিয়ে বেঁধে শৈলারোহী নির্বিঘ্নে আরোহণ, অবরোহণ কিংবা অবস্থান করতে পারে।

আর্টিফিসল্ ক্লাইম (**Artificial Climb**)—কঠিন শৈলপ্রাচীরে পিটন কিংবা বোল্ট অথবা ষ্টিরাপের সাহায্যে আরোহণ।

ব্যাকিং আপ (**Backing-Up**)—চিমনীর একদিকের দেওয়ালে পা রেখে এবং বিপরীত দেওয়ালে পিঠের চাপ দিয়ে ওঠা।

বিলে (**Belay**)—পতন থেকে রক্ষার জন্য কঠিন শৈলপ্রাচীরে আরোহীদের পরস্পরের মধ্যে বাঁধা দড়ি। বিলের দড়ি আরোহীকে কঠিন শৈল প্রাচীরে অবস্থানের নিশ্চয়তা দেয় এবং সহ-আরোহীকে আরোহণে সাহায্য করে।

ব্রিজিং বা স্ট্র্যাড্লিং (**Bridging or Straddling**)—পাহাড়ের চিমনী অথবা গ্রুভ অথবা কর্ণারের বিস্তৃত দেওয়ালের দু'পাশে পা রেখে ফাটলের দিকে মুখ করে আরোহণ। এ প্রক্রিয়ায় চওড়া ফাটল চমৎকার আরোহণ করা যায়।

বার্নিং গ্লাভস্ (**Burning Gloves**)—আরোহণ কিংবা অবরোহণের সময় সহ-আরোহীকে বিলে করার সময় চামড়ার অথবা পশমের দস্তানায় দড়ির ঘর্ষণজনিত উত্তাপ। এই ঘর্ষণে হাতে ফোসকা পড়তে পারে।

বাট্রেস (**Buttress**)—প্রসারিত বিশাল গিরিশিরা যা অবশিষ্ট গিরিশিরা থেকে গালি অর্থাৎ নালার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটি প্রাচীরের মতো দেখায়।

কেয়্যার্ণ (Cairn)—শিলাস্তূপ। পর্বতশীর্ষে অথবা গিরিবর্ত্মের ওপর অথবা চলার পথের নিশানা হিসাবে কেয়্যার্ণ স্থাপন করা হয় শিলার ওপর শিলা স্থাপন করে।

শিলিং (Ceiling)—ওভারহ্যাং রক্-এর নিচে পাথরের ছাদ। একে রুফ্ও বলে।

চিমনী (Chimney)—শৈলগাত্রের লম্বালম্বি ফাটল, যেখানে আরোহীর দেহ স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারে।

চোক্স্টোন (Chockstone)—চিমনী অথবা গালি অথবা ফাটলের মধ্যে আটকে থাকা প্রস্তরখণ্ড।

চোস্ (Choss)—অপরিচ্ছন্ন, আল্গা, ভাঙ্গাচোরা অথবা শ্যাওলাধরা প্রস্তরখণ্ড।

কল (Col)—সুউচ্চ পর্বতের উপরিস্থিত গিরিবর্ত্ম।

কুম (Coomb)—সুউচ্চ ঝোলানো উপত্যকা যেখানে সাধারণত গিরিপ্রাচীর অবস্থিত।

কর্ণার (Corner)—খাড়াই শৈলপ্রাচীরের লম্বালম্বি ফাটলের কোণ।

কর্ণিস (Cornice)—সুউচ্চ তুষারাবৃত গিরিশিরা অথবা পর্বত শিখরের ওপর বায়ুতাড়িত বরফের ঝুলন্ত ছাদবিশেষ। কর্ণিসের ওপর দিয়ে চলা খুবই বিপজ্জনক। দেহের ভারে ঝুলন্ত বরফ ভেঙ্গে পড়তে পারে।

ক্র্যাক্ (Crack)—ফাটল। শৈলপ্রাচীরের লম্বালম্বি ফাটলে আরোহীর দেহ প্রবেশ করে না বটে, তবে ফাটলের মধ্যে হাত, পা অথবা আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে আরোহণ করা যায়। আড়াআড়ি ফাটল ধরেও ভাল আরোহণ করা যায়।

ক্রাক্স (Crux)—শৈলপ্রাচীরের কঠিনতম আরোহণের অংশ বিশেষ।

ডেড্ হ্যাণ্ড (Dead Hand)—যে হাতে করেল করা দড়ি ছাড়া হয়। আরোহণ অথবা অবরোহণের সময় আরোহীর বিলে দড়ি কোমর অথবা কাঁধের ওপর রেখে বিলেকারী যে হাতে দড়িটিকে ধীরে ধীরে ছাড়ে সেটিই ডেড্ হ্যাণ্ড। এই হাতে আরোহীর পতন রোধ করা যায়।

ডাইরেক্টিং হ্যাণ্ড (Directing Hand)—যে হাতে আরোহীর কোমর থেকে আসা বিলে দড়ি বিলেকারীর হাতে থাকে।

ইট্রিয়ার (Etrier)—দীর্ঘ ওভারহ্যাং রকে কৃত্রিম উপায়ে আরোহণের জন্য দড়ির তৈরি ছোট মই। দু'গাছা দড়িতে এ্যালুমিনিয়াম অথবা কাঠের সরু সিঁড়ি লাগানো থাকে।

ফ্রিক্‌শন্ ব্রেক (Friction Brake)—আরোহণ-অবরোহণের সময় দড়ি ছাড়া অথবা টেনে নেওয়ার সময় যদি আরোহীর পতন হয়, তাহলে পতন-জনিত দড়ির প্রচণ্ড আকর্ষণ বিলেকারীর কোমরের ওপর দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে পতন রোধ করে।

গ্যাংওয়ে (Gangway)—শৈলপ্রাচীরের গায়ে আড়াআড়ি অথবা কোণাকুণি ভাবে অবস্থিত সূক্ষ্ম পাথরের শিরা। এই শিরার ওপর দিয়ে ভাল আরোহণ করা যায়।

গার্ডেনিং (Gardening)—শৈলপ্রাচীরে অথবা ফাটলে অথবা চিমনীতে আরোহণের পূর্বে ধুলোমাটি, শ্যাওলা বা গাছগাছালি সাফ করা।

গার্ডেল (Girdle)—সুদীর্ঘ খাড়াই পর্বতগাত্রে আডাআড়ি ভাবে অতিক্রম করা।

গ্রুভ (Groove)—পাথরের স্লাবে 'V' আকারের হেলানো ফাটল।

গালি (Gully)—বিশাল নালা। বাট্রেসের উভয় দিকে এই নালা দেখা যায়। গালি গিরিশিবা থেকে পাহাড়ের এক বিশাল অংশকে বিভক্ত করে বাট্রেসরূপে।

হ্যাণ্ড জ্যাম (Hand Jam)—ফাটলের মধ্যে হাত রেখে জ্যাম করে আরোহণ।

হ্যাণ্ড ট্র্যাভার্স (Hand Traverse)—যে শৈলপ্রাচীরে পা রাখার মতো হোল্ডস্ নেই এবং আরোহীকে হাতের সাহায্যে ঝুলে কঠিন পথ পার হতে হয়।

আইস এক্স (Ice Axe)—সাধারণত ২½ থেকে ৩ ফুট লম্বা। কাঠের হাতলের মাথায় পিক্ এবং ব্লেড আছে যার দ্বারা বরফে পা রাখার ধাপ ও গর্ত করা হয় এবং বরফের টুকরো ব্লেড দিয়ে সাফ করা হয়। তুষার কুঠার পর্বতারোহীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

ইন্‌কাট হোল্ড (Incut Hold)—শিলাখণ্ডের গায়ে গভীর আড়াআড়ি ফাটল, যাতে হাতের আঙুল অথবা পায়ের ভাল গ্রিপ হয়।

ইন্‌সারটেড চোক্‌স্টোন (Inserted Chockstone)—ফাটলের মধ্যে আরোহী কর্তৃক প্রবেশ করানো ছোট প্রস্তরখণ্ড। এর দ্বারা গ্রিপ অথবা এ্যাঙ্‌কার করা যায়।

জ্যাম্‌ড নট (Jammed Knot)—রানিং বিলে করার সময় স্লিং-এ গিঁট লাগিয়ে ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করানো আর একটি নিরাপদ উপায়। এতে ফাটলের মধ্যস্থিত গিঁট দেওয়া স্লিং খুলে আসার আশংকা থাকে না।

জ্যাম্‌ড নাট (Jammed Nut)—ফাটলের মধ্যে আটকানোর জন্য স্লিং-এ বিভিন্ন আকারের ধাতব-নাট লাগানো থাকে এবং প্রয়োজন মতো ফাটলের আকারেব নাট আটকে যায় স্লিং সমেত ফাটলের মধ্যে।

জাগ হ্যাণ্ডেল হোল্ড (Jug Handle Hold)—বড় ইন্‌কাট ফাটল, যার মধ্যে হাতের আঙ্গুল ভাঁজ করে ধবা যায়।

ক্যারাবিনার (Karabiner)—ডিম্বাকার ধাতব ক্লিপ। একটি দরজা আছে, যার মধ্য দিয়ে আরোহণের দড়ি অথবা স্লিং প্রবেশ করিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া যায। পুলির মতো কাজ করে। রানিং বিলে, এ্যাঙ্‌কার, এ্যাবসেল ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

নিটিং (Knitting)—দড়ি জড়িয়ে যাওয়া বা গিঁট লাগা।

লেব্যাক (Layback)—লম্বালম্বি ফাটল ধরে শরীর পিছনে ঝুলিয়ে হাত এবং পা নিকট দূরত্বে রেখে আরোহণ।

লিডার (Leader)—শৈলারোহণে রোপের প্রথম আরোহী অর্থাৎ নেতা।

লিপ্‌ (Lip)—ওভারহ্যাং পাথরের প্রান্ত।

ম্যাণ্টেলসেলফ্‌ (Mantelshelf)—রক্‌ ফেসের গায়ে সমতল সংকীর্ণ তাক বিশেষ। এর ওপরে অথবা নিচে ধরার মতো হোল্ডস্‌ থাকে।

ন্যাচারাল ক্লাইম (Natural Climb)—রক্‌ ফেসের সহজতম পথে আরোহণ। খাড়াই শীর্ষ আরোহণের জন্য ফাটল, চিমনী, স্ল্যাব ইত্যাদি যা পাওয়া যাবে তার সুযোগ নিয়ে আরোহণ করা। ন্যাচারাল ক্লাইম আর্টিফিস্‌ল ক্লাইম-এর ঠিক বিপরীত।

নীড্‌ল্‌ (Needle)—সুউচ্চ খাঁজকাটা শৈলশিখর।

নৌজ্‌ (Nose)—নিরেট খাড়া শৈলশিরা।

পাস্‌ (Pass)—গিরিবর্ত্ম। সুউচ্চ গিরিশিরার ওপর দিয়ে যে পথ পাহাড়ের উভয় দিকের উপত্যকাকে যুক্ত করেছে।

পেগ (Peg)—স্টীল, ধাতু অথবা লোহার তৈরি পেরেক বিশেষ।

পেগ হ্যামার (Peg Hammer)—ফাটলের মধ্যে পেরেক লাগাবার ছোট হাতুড়ি।

পেণ্ডুলাম (Pendulum)—শৈলপ্রাচীর আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করার সময় পতনের ফলে আরোহীর বিলে দড়িতে দোলায়মান ঝুলন্ত অবস্থা। অবশ্য কঠিন আরোহণের সময় ফাটলশূন্য স্থান অতিক্রম করার জন্য ঘড়ির দোলক যন্ত্রের মতো ঝুলে পার হওয়াকেও পেণ্ডুলাম ক্লাইম বলে।

পিন্‌সার গ্রিপ (Pincer Grip)—হাতের আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে শিলার ফাটলে দেহের ভারসাম্য রাখা।

পিন্যাক্‌ল্‌ (Pinnacle)—সুচলো শিখর। শৈলপ্রাচীরের সুচলো কঠিন অংশই পিন্যাক্‌ল্‌।

পিচ্‌ (Pitch)—দু'জন আরোহীর মধ্যবর্তী আরোহণ পথের অংশ বিশেষ।

পিটন (Piton)—ধাতববস্তু, স্টীল অথবা লোহার তৈরি পেরেক বিশেষ। এর মাথার দিক চ্যাপটা এবং নিচের দিক ক্রমশ সরু। মাথায় গোলাকার গর্ত আছে। সূক্ষ্ম ফাটলযুক্ত শৈলগাত্রে পিটনের সাহায্যে গ্রিপ তৈরি করা যায়। পিটন আর পেগ একই কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রেসার হোল্ড (Pressure Hold)—কোমরের উচ্চতায় শিলাগাত্রে হাতের চাপ দিয়ে উপর দিকে আরোহণ প্রক্রিয়া।

প্রোটেকশন (Protection)—আরোহণ-অবরোহণের সময় পতনের দূরত্ব কমানোর জন্য যে রানিং বিলে লাগানো হয়।

র‍্যাপেল্‌ (Rappel)—এ্যাবসেল দেখুন।

রলবোল্ট (Rawlbolt)—ওভারহ্যাং রক্‌-এর নিচের ছাদ বা শিলিং-এ যদি ধরার মতো কোনো ফাটল না থাকে, তাহলে ড্রিলের সাহায্যে শৈলগাত্রে গর্ত করে রলবোল্ট লাগিয়ে তাতে ক্যারাবিনার ক্লিপ করে ভাল হোল্ড তৈরি করা যায়।

রীব্‌ (Rib)—রকের সূক্ষ্ম ধার।

রিজ্‌ (Ridge)—সুউচ্চ গিরিশিরা। এর উভয় পার্শ্বে উপত্যকা থাকে। সূক্ষ্ম ধারালো শৈলশিরাকেও রিজ্‌ বলে।

রুফ্‌ (Roof)—ওভারহ্যাং শিলার নিচের ছাদ।

রুট (Route)—শৈলারোহণ বা পর্বতারোহণের নির্দিষ্ট পথ।

রানিং বিলে (Running Belay)—কঠিন শৈলগাত্র আরোহণের সময় পাথরের খোঁচ অথবা পিটনের সাহায্যে এ্যাঙ্কার করে তার মধ্যে ক্যারাবিনার ও স্লিং দিয়ে নিরাপদ হওয়া। রানিং বিলে থাকলে পতনের দূরত্ব কমে যায় এবং আরোহীর মনোবল বাড়ে।

রান-আউট (Run-out)—শৈলগাত্র আরোহণের সময় লিডারের প্রয়োজন মতো ব্যবহৃত দড়ির অংশ।

স্যাড্‌ল্ (Saddle)—একই গিরিশিরার উপর দুটি শিখরের মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ গিরিবর্ত্ম। অনেকটা ঘোড়ার পিঠে বসার জিন্-এর মতো দেখতে।

স্কুপ্ (Scoop)—শিলাগাত্রে গোলাকার খাঁজ বা গর্ত।

স্ক্রী (Scree)—পর্বতগাত্রের নিচে স্তূপীকৃত ছোট বড় পাথর ও বালি।

সেকেণ্ড-ম্যান (Second man)—দ্বিতীয় আরোহী। শৈলারোহীদলের নেতার প্রধান সহকারী।

শার্প এণ্ড (Sharp End)—শৈলারোহীদলের নেতার দিকের দড়ির অংশ।

সাইড হোল্ড (Side Hold)—হাত দিয়ে ধরার পার্শ্ববর্তী ফাটল। এই ফাটল এক হাতে ধরে দেহের ভারসাম্য রেখে আরোহণ করা যায়।

স্ল্যাব্ (Slab)—৩০ থেকে ৭৫ ডিগ্রি কোণাকুণি খাড়াই শিলাখণ্ড।

স্লিং (Sling)—নাইলন অথবা ম্যানিলা দড়ির তৈরি গোলাকার লুপ। স্লিং দিয়ে এ্যাবসেল, এ্যাঙ্কার, রানিং বিলে ইত্যাদি করা যায়।

স্পাইক বিলে (Spike Belay)—রকের খোঁচ ইত্যাদিতে এ্যাঙ্কার করে আরোহণ-অবরোহণে দড়ির সাহায্যে বিলে করা।

স্পার্ (Spur)—গিরিশিরা। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা শিরদাঁড়া বিশেষ।

স্ট্যান্স্ (Stance)—বিলে করার সময় শৈলগাত্রে পা রাখার মতো ফুট হোল্ডস্-এ নিরাপদে দাঁড়ানো অবস্থা।

স্টম্যাক্ ট্রাভার্স (Stomach Traverse)—আড়াআড়ি বা হরিজন্টল্ চিমনীর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠা।

স্ট্র্যাড্‌লিং (Straddling)—ব্রিজিং দেখুন।

টেরাস্ (Terrace)—পাহাড়ের শীর্ষে অথবা পাদদেশে অবস্থিত ঘাসের জমির ঢাল।

থ্রেড্ বিলে (Thread Belay)—বৃক্ষ অথবা চোক্‌স্টোন অথবা পাথরের গর্তে শ্লিং অথবা দড়ির সাহায্যে এ্যাঙ্‌কার করে বিলে করার প্রথা।

ট্র্যাভার্স (Traverse)—আড়াআড়ি ফাটল ধরে আরোহণ। এ প্রক্রিয়ায় উপরের চেয়ে পাশেই ভাল আরোহণ করা হয়।

আণ্ডারকাট্ হোল্ড (Undercut Hold)—আড়াআড়ি ফাটল বা রক্ ফেসের নিচে লুকানো জায়গায় থাকে এই ফাটল। ফাটলে হাতের আঙুল রেখে বাইরের দিকে ঝুলে আরোহণ করতে হয়।

ওয়াল (Wall)—৭৫ ডিগ্রি কোণাকুণি শিলাগাত্র বা রক্ ফেস। কিছুটা ঝুলন্ত অবস্থায় বা ওভারহ্যাং থাকে।

ওয়েজ্‌স্ (Wedges)—বড় ফাটলে যেখানে রক্ পিটন কাজে লাগে না সেখানে কাঠের তৈরি মোটা চোক্ ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা ভাল এ্যাঙ্‌কার হতে পারে।

ওয়েজিং (Wedging)—ফিসার্ জাতীয় ফাটলের মধ্যে বাহু এবং পা প্রবেশ করিয়ে আরোহণ করা।

ঃ বর্ণানুক্রমিক সূচী ঃ

পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহণ সংস্থা

* মাউন্টেনীয়ার্স ক্লাব
৯১।৩৫ টালিগঞ্জ রোড
কলিকাতা-৩৩

* হিমালয়ান এ্যাসোসিয়েশন
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

* যাদবপুর ইউনিভার্সিটি
মাউন্টেনীয়ারিং এণ্ড হাইকিং ক্লাব,
যাদবপুর ইউনিভার্সিটি,
কলিকাতা-৩২

* গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার এক্সপ্লোরেশন
কমিটি, ৭৬ পিয়ারী মোহন রায়
রোড, কলিকাতা-২৭

হিমালয়ান ফেডারেশন
৬৩-ই মহানির্বাণ রোড
কলিকাতা-২৯

হাইকার্স ক্লাব
৩ চন্দ্রমোহন সুর লেন, কলিকাতা-৪

ডায়ানা এ্যাসোসিয়েশন
২০ সুলতান আলম রোড
কলিকাতা-৩৩

* পর্বত অভিযাত্রী সংঘ
আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

* পথিকৃত
২১৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-৪৭

ইনষ্টিটিউট অব এক্সপ্লোরেশন
১১।বি ইণ্ডিয়ান মিরার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩

* মাউন্টেন লাভার্স এ্যাসোসিয়েশন
আপকার গার্ডেনস, আসানসোল

হিমালয়ান লাভার্স এ্যাসোসিয়েশন
৮৩।১৪ রসারোড ইষ্ট, কলিকাতা-৩৩

* দূতাগার
৪২।২ বি, হরিশ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

ট্রেক এণ্ড টুর ক্লাব
৮ হেমচন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-২৩

* হিমালয়ান এন্‌জয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন
কোয়াটার্স নং সি।৩।বি, স্ট্রীট নং ১
চিত্তরঞ্জন, বর্দ্ধমান

এ্যাডভেঞ্চার এ্যাসোসিয়েশন
৬ মহেশতলা লেন,
কলিকাতা ২৩

* নর্থবেঙ্গল মাউন্টেনীয়ার্স
এ্যাসোসিয়েশন, কেয়ার অব, রবীন্দ্র
হোমিও ফার্মেসী, কালীবাড়ি রোড,
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

* দি হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং
ইনষ্টিটিউট, জওহর পর্বত, দার্জিলিং

* হিমচক্র
মাহেশ, হুগলী

* চিহ্নিত সংস্থা নিয়মিত শৈলারোহণ শিক্ষাক্রমের আয়োজন করেন শিক্ষাক্রম সাধারণতঃ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়।